রাত নিঝুম

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

রাত নিঝুম

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ❑ কলকাতা-৭০০০০৯

RAT NIJHUM
A BENGALI NOVEL
by
Niharranjan Gupta

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৬৪

❑ প্রকাশক ❑
সমীরকুমার নাথ ❑ নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ❑ কলকাতা ৭০০০০৯

❑ অক্ষরবিন্যাস ❑
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
২১বি রাধানাথ বোস লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

❑ মুদ্রক ❑
অজন্তা প্রিন্টার্স
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

এক

কিরীটী

কি বিশ্রী বর্ষা।

ঝর—ঝর—অবিরাম ঝরছে তো ঝরছেই—থামবার শীগগিরী কোন সম্ভাবনাই নেই।

তাই আজ কয়দিন থেকেই কিরীটীর মনটাও ঐ বর্ষার মেঘলা আকাশটার মতই যেন ভার ভার হয়ে আছে। হাতে কোন কাজকর্মও নেই। বিশ্রী একঘেয়ে—কারও এ ধরণের অবসর ভালো লাগে নাকি?

সারাটা দিন ধরে একটা রহস্য উপন্যাস পড়েছে কিরীটী—বিকেলের দিকে আর ভাল লাগছিল না পড়তে। বইটা মুড়ে হাতের মধ্যে নিয়ে বসবার ঘরে একটা সোফার উপর, খোলা জানালা পথে বাইরের মেঘাচ্ছন্ন বৃষ্টি ঝরা আকাশটার দিকে ক্লান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বসে ছিল।

এমন সময় টেলিফোনের বেল বেজে উঠলো, ক্রিং! ক্রিং!

অনচ্ছিার সঙ্গেই হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিলো।

হ্যালো।

মিঃ কিরীটী রায়?

কথা বলছি—বলুন। আপনি কে?

আমাকে তো আপনি চিনবেন না—

কোথা থেকে কথা বলছেন?

আমি শ্রীপুর স্টেট থেকে বলছি, জমিদার শশাঙ্ক চৌধুরীর ভাই মৃগাঙ্ক চৌধুরী।

বলুন।

আমাদের বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে সেইজন্য আপনার সাহায্য চাই—

কি রকম দুর্ঘটনা?

দেখুন, আমাদের বাড়ির অনেকদিনকার পুরানো করালীচরণকে আজ সকালে হঠাৎ তার ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। স্থানীয় থানা থেকে দারোগাবাবু এসেছিলেন—তারা অবিশ্যি যা করবার করবেন— আর কি যে তারা করবেন তাও আমরা জানি। করালীচরণ এ বাড়ির বহুদিনকার পুরানো লোক—বলতে গেলে সে এ বাড়িরই একজন

হয়ে গিয়েছিল—তাই ব্যাপারটা আমাদের কাছে খুবই মর্মান্তিক হয়েছে। আমরা চাই সত্যিকারের ব্যাপারটা জানতে। তাই বলছিলাম আপনি যদি দয়া করে আমাদের এখানে একবার আসেন তবে বড় ভাল হয়। আমাদের মনে হয় আপনি হয়ত এ ব্যাপারের একটা কিনারা করতে পারবেন। অবিশ্যি আপনার ফিস সম্পর্কে—

কিরীটী বলে, ফিসের কথা থাক— আমি যাবো, কিন্তু আপনাদের ওখানে কি করে যেতে হবে যদি বলে দেন—

মৃগাঙ্কবাবু বলেন— ইচ্ছা করলে আপনি গাড়িতেও আসতে পারেন—ট্রেনেও আসা যায় এখানে তবে একটু ঘুরে আসতে হয়। তবে যদি স্টীমারে আসেন তাহলে একেবারে ঘাটে এসে নামতে পারেন।

স্টীমার!

হ্যাঁ—আহিরীটোলা ঘাট থেকে সকাল—দুপুর ও সন্ধ্যায় তিনবার স্টীমার আসে।

স্টীমারেই তাহলে যাবো।

আজই আসবেন কি?

কাল যাবো।

বেশ—কোন স্টীমারে আসবেন বলুন—ঘাটে আমাদের লোক রাখব।

আপনিই বলুন না কোন স্টীমারে যাবো—

সকাল দশটা দশের স্টীমারে আসতে পারেন—

বেশ তাই যাবো।

জেটিতে লোক থাকবে।

আচ্ছা। আর একটা কথা।

বলুন।

মৃত দেহটা কি ময়না তদন্তের জন্য পাঠান হয়েছে?

না—

তাহলে ওটা আমি যাওয়া পর্যন্ত রাখবার ব্যবস্থা করবেন।

করবো।

নমস্কার।

কিরীটী হাঁক দিল, জংলী।

ভৃত্য জংলী ঘরে প্রবেশ করল; বাবু?

দেখ, কাল সকালে আমাকে একবার শ্রীপুরে যেতে হচ্ছে। ফিরবো কখন ঠিক করে বলতে পারছি না। কেউ যদি আমার খোঁজ করতে আসে তবে তাকে বলিস সন্ধ্যার পরে যেন আসে।

কিরীটী জংলীর সঙ্গে কথা বলে ফোনটা আবার তুলে নিল।

হ্যালো 3033 বড়বাজার।

হ্যালো, কে কিরীটী নাকি? রিসিভারে জবাব এল।

কে সুব্রত? হ্যাঁরে আমি।

কী ব্যাপার?

শ্রীপুর চলেছি, যাবি নাকি? —তা হলে তোকে ওখান থেকে কাল সকালে pick up করে নিই।

হঠাৎ শ্রীপুর—

আপাততঃ বিশেষ কিছুই জানিনা। সেখানকার জমিদার মিঃ শশাঙ্ক চৌধুরীর বাড়িতে তাদের এক পুরানো চাকর নিহত হয়েছে, তারই তদন্তের আহ্বান এসেছে। তাই ভাবলাম একা একা যাব, যদি সঙ্গে যাস।

যাবো মানে—নিশ্চয়ই যাবো।

কিরীটী হাসতে হাসতে ফোনটা নামিয়ে রাখল।

পরের দিন সকালে।

সাজপোশাক সেরে নিয়ে কিরীটী জংলীকে একটা ট্যাক্সি ডাকতে বললে।

ট্যাক্সিতে চেপে কিরীটী সোজা সুব্রতদের বাড়ি আমহার্স্ট স্ট্রীটের দিকে চালাতে আদেশ দিল। সুব্রত একপ্রকার প্রস্তুত হয়েই দরজার সামনে অপেক্ষা করছিল। কিরীটী যেতেই সুব্রত চায়ের আদেশ দিল। কিছুক্ষণ পরে ভৃত্য চা নিয়ে এল। চা পান করেই ওরা বের হয়ে পড়ে। এবং ওরা যখন স্টীমার ঘাটে এসে পৌঁছল, কিরীটী রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে দেখে সকাল ৭·১০ এর স্টীমার ছাড়তে আর মাত্র মিনিট পাঁচেক বাকী।

ট্যাক্সিটাকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ওরা বুকিং অফিসের দিকে এগিয়ে চলল।

কিরীটী স্টীমারে উঠে পড়ল।

সিটি বাজিয়ে স্টীমার ছেড়ে দিল।

বর্ষার গঙ্গা। গৈরিক জলধারা তার দুকূলপ্লাবী।

ইলিশ মাছের নৌকাগুলো ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝেমাঝে দু'একটা লঞ্চ বা ফেরী স্টীমার এদিক ওদিক যাতায়াত করছে। দু'জনে এসে রেলিংয়ের ধারে দাঁড়াল।

এই শ্রীপুর স্টেটের জমিদারের সঙ্গে তোর আগে কোন আলাপ ছিল নাকি কিরীটী? সুব্রত জিজ্ঞাসা করল।

না—কিরীটী বললে, তবে এঁদের নাম শুনেছি মস্ত বড় ধনী লোক, অগাধ পয়সা, দু'দুটো মিলের মালিক—

ব্যাপারটা কি মনে হচ্ছে তোর?

বাড়ির পুরানো চাকর অনেকদিনকার লোক—হয়ত জমিদার বাড়ির অনেক কিছুই সে জানত, যে কারণে আকস্মিক মৃত্যুটা তার চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে— আর তাতেই আমার স্মরণাপন্ন হয়েছে—

তাই তোর ধারণা?

নচেৎ জমিদার বাড়িতে সামান্য একটা চাকরের মৃত্যু এমন বিশেষ কোন important বা notice করবার মত ব্যাপার নয় যাতে করে আমার মত একজন বেসরকারী সত্যানুসন্ধানীর প্রয়োজন হতে পারে, তাঁদের। তাই মনে হয় এই মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চয়ই কোন জটিলতা আছে যার জন্য হয়ত ওরা আমার সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে।

তোর তাই মনে হয়?—

হ্যাঁ—নিশ্চয়ই এই হত্যা ব্যাপারের মধ্যে—অবিশ্যি যদি হত্যাই হয়—তাহলে কোন জটিল রহস্য জট পাকিয়ে আছে—

কিন্তু—

বুঝতে পারছি তুই কি বলতে চাস সুব্রত—জমিদার বাড়ি—প্রচুর অর্থ —অনেক লোকজন। আত্মীয়-স্বজন কে কোন মতলব মনে মনে পোষণ করছে কে জানে। কার interest —স্বার্থ কিসে কে বলতে পারে?

কাজেই ওখানে কেউ যদি ঐ হত্যার ব্যাপারটার মীমাংসার জন্য আগ্রহান্বিত হয়েই থাকে তাহলে আশ্চর্যের কিছুই নেই—বলতে বলতে কিরীটী মৃদু হাসে।

সত্যি—সুব্রত বলে, এত তলিয়েও তুই সব ব্যাপার ভাবতে পারিস কিরীটী—

জলের তলে ডুব না দিলে কি রত্ন মেলে রে? —তাছাড়া ডুব দিয়ে খুঁজে খুঁজে রত্ন তোলারও একটা বিচিত্র উত্তেজনা আছে বৈ কি—তাই এই রহস্য ভেদ করার ব্যাপারটার মধ্যে ঠিক তেমনি একটা বিচিত্র উত্তেজনা ও আনন্দের আস্বাদ আমি পাই—

কিন্তু আমি আশ্চর্য হই—

আশ্চর্য হোস—কেন?

তোর এই যুক্তি, বিশ্বাস ও বুদ্ধি দিয়ে তোকে কঠিন হতে কঠিন রহস্যও উদ্‌ঘাটন করতে যখন দেখি—

কিরীটী প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে বলে, মানুষেরই রচিত রহস্য তা মানুষ ভেদ করবে এতে তো আশ্চর্যের কিছু নেই সুব্রত। একটা জিনিষ ভুলিস কেন—মানুষ তো, সে তার সহজাত দুর্বলতা বাদ দেবে কি করে? তা হয় না, মানুষ

মানুষের কাছে চিরদিনই হার মানতে বাধ্য হয়েছে। মানুষই জটিল প্রব্লেম তৈরী করে আবার মানুষই তা solve করে। এ-ই দুনিয়ার নিয়ম। বলতে বলতে কিরীটী তার চশমাটা চোখ থেকে খুলে রুমালের মধ্যে ঘসতে লাগল।

বেশী পথ নয়—ঘণ্টা আড়াইয়ের মধ্যেই ঘাটে স্টীমার লাগে।

জমিদার বাড়ির গাড়ি ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। বেলা খুব বেশী হলে সবে সাড়ে বারোটা তারই মধ্যে মেঘের আড়াল থেকে হঠাৎ সূর্যের ঝলকানি জেগেছে।

স্টীমার ঘাট থেকে জমিদার বাড়ি প্রায় ক্রোশটাক পথ হবে। গঙ্গার কোল ঘেঁষে জমিদারের প্রকাণ্ড চক মিলান বাড়ি। ওদের স্টীমার স্টেশনে রিসিভ করতে এসেছিল, স্টেটের প্রাইভেট সেক্রেটারী অশোক সেন।

ছেলেটির বয়স অল্প। বছর তেইশ চব্বিশ হবে, হালে বি. এ. পাশ করে স্টেটের চাকুরী নিয়েছে। আলাপ পরিচয়ের পর একসময় কিরীটী জিজ্ঞাসা করল, পোস্ট মর্টেমের কোন ব্যবস্থা হয়েছে, জানেন কিছু?

আজ্ঞে যতদূর শুনেছি মৃগাঙ্কবাবু থানা অফিসারকে আপনার কথা বলায় লাস এখনো ময়না তদন্তে পাঠান হয়নি। জমিদার বাড়িরই মালীর ঘরের পাশের ঘরে পুলিশ প্রহরায় রয়েছে। আপনার দেখা হয়ে গেলে লাস ময়না তদন্তে যাবে।

কথাটা মিথ্যে নয়—কিরীটী অনুরোধ করায় গতকাল মৃগাঙ্ক চৌধুরী ঐ ব্যবস্থাই করেছিল?

বিরাট চকমিলান জমিদার বাড়ি, প্রাসাদ বললেও বুঝি অত্যুক্তি হয় না।

গেটে প্রহরারত বন্দুকধারী শিখ দারোয়ান।

গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকে গাড়ি বারান্দার সামনে এসে দাঁড়াল। অশোকই ওদের সাদর অভ্যর্থনা করে বাইরের ঘরে নিয়ে গেল।

মৃগাঙ্ক বৈঠক খানাতেই অপেক্ষা করছিল। অদূরে একটা চেয়ারে বসে পুলিশের দারোগা। মাঝে মাঝে তারা কী সব কথাবার্তা বলছে। কিরীটী আর সুব্রত এসে ঘরে প্রবেশ করতেই মৃগাঙ্কবাবু ও দারোগা উঠে দাঁড়ালেন। অশোকই পরিচয়টা করিয়ে দিল, ইনি আমাদের ছোটবাবু মৃগাঙ্ক মোহন চৌধুরী। আর ইনি হচ্ছেন মিঃ কিরীটী রায়।

মৃগাঙ্ক মোহন হাত তুলে নমস্কার করলেন।

কিরীটী লক্ষ্য করলে মৃগাঙ্ক মোহনের ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলের পরের আঙ্গুলটি নেই। একেবারে গোড়া থেকে কাটা।

ডান হাতের দু-আঙ্গুলের ফাঁকে একাট জ্বলন্ত সিগারেট। আঙ্গুল দুটোর মাথায় নিকোটিনের হলদে ছাপ গাঢ় হয়ে উঠেছে।

চোখে এক জোড়া কালো গগ্‌লস।

গগ্‌লসের কালো কাঁচের আড়াল থেকেও দু'জোড়া চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন গায়ে এসে বেঁধে।

উঁচু লম্বা গড়ন। দেখলে বেশ বলিষ্ঠ বলেই মনে হয়।

আপনিই কাল সন্ধ্যায় আমায় ring করেছিলেন? মৃগাঙ্ক মোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে কিরীটী জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ—মৃগাঙ্ক জবাব দেয়।

তারপর করালীচরণের মৃত্যুর ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত শোনে মৃগাঙ্ক মোহনেরই মুখ থেকে কিরীটী।

গতকাল প্রত্যুষে করালীচরণের মৃতদেহ ভৃত্যদের মহলে তার ঘরে আবিষ্কৃত হয়।

অনেক দিনকার পুরানো চাকর করালী—এ বাড়িতে তাঁর যে একটা কেবল আধিপত্যই ছিল তাই নয়—সবাই সমীহ করেও চলত তাকে বেশ।

ভৃত্যদের মহলে একটা আলাদা ঘরে সে থাকত।

দারোগা সাহেবের ধারণা—ব্যাপারটা হত্যা।

কিন্তু মৃগাঙ্কমোহনের ধারণা অন্যরূপ।

তার ধারণা আত্মহত্যা।

কিরীটী প্রশ্ন করে, কেন হলো আপনার এ ধারণা মৃগাঙ্কবাবু?

দুই

বোতাম

মৃগাঙ্কমোহন বলে, করালীচরণ যে ঠিক খুন হয়েছে, তা আমার মনে হয় না মিঃ রায়। কেউ তাকে হত্যা করেনি, সে নিজেই আত্মহত্যা করেছে। দারোগাবাবুর মত অবিশ্যি তা নয়।

আমাকে ব্যাপারটা আগাগোড়া বলুন মৃগাঙ্কবাবু।

মৃগাঙ্কমোহন আবার বলতে শুরু করে, দাদার শরীরটা আজ কিছুদিন থেকে খারাপ যাচ্ছিল। তাই তিনি ও বৌদি শিলং বেড়াতে গেছেন। এই সময় এই বিপদ। দাদাকে টেলিগ্রাম করেছি, হয়ত আজ কালই তিনি এসে পৌঁছবেন। করালী আজ আমাদের বাড়ীতে প্রায় কুড়ি বছরেরও উপর আছে—যেমন বিশ্বাসী তেমনি অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির। তার মত লোকের যে এ সংসারে শত্রু থাকতে পারে এইটাই আশ্চর্য।

কান্নায় মৃগাঙ্কমোহনের স্বর বুঁজে এল।

কিন্তু আপনি যে বলছেন আত্মহত্যা করেছে সে, তাই বা কেন বলছেন? কিরীটী প্রশ্ন করে এবার।

তা ছাড়া আর কি হতে পারে বলুন। হাতে ভোজালী ছিল ধরা।

সেটা এমন কিছু একটা বড় কথা নয়।

কিন্তু আত্মহত্যারও তো একটা কারণ থাকা দরকার। সেরকম কিছু—

না। সে রকম কিছু অবিশ্যি আমি দেখতে পাচ্ছি না—

তবে?

তবে একটা কথা আছে মিঃ রায়।

কি বলুন?

ইদানীং মাস দুই ওকে যেন কেমন বিষণ্ণ, চিন্তিত মনে হতো।

কারণ কিছু কখন জিজ্ঞাসা করেছেন?

করেছিলাম—

কি জবাব দিয়েছিল?

কিছুই বলেনি। আমাকেও না দাদাকেও না। দাদা ওকে সঙ্গে করে শিলং নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তাও ও গেল না।

হুঁ। আচ্ছা চলুন—মৃতদেহটা একেবার দেখে আসা যাক।

চলুন।

সকলে তখন মালির ঘরে পাশে ছোট ঘরটায় যার মধ্যে মৃতদেহ পুলিশ প্রহরায় রাখা ছিল সেখানে এসে দাঁড়াল।

ওরা আসতেই প্রহরী সরে দাঁড়ায়, ওরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

ছোট একটা ঘর।

করালীর মৃতদেহটা মেঝের ওপরে একটা চাদর ঢাকা ছিল। চাদরটা তুলে নেওয়া হলো কিরীটীর নির্দেশে।

ষাটের কাছাকাছিই প্রায় বয়স বলে মনে হয়। মাথার চুল পাতলা এবং সবই প্রায় পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে।

দুটো চোখ খোলা এবং সে দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকলেও মনে হয় তার মধ্যে একটা ভীতি রয়েছে যেন।

ভয়ে বিস্ফারিত।

চিৎ করে শোয়ান ছিল মৃতদেহ—কিরীটীর নির্দেশেই আবার দেহটা উপুড় করে দেওয়া হলো ক্ষত চিহ্নটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য।

ঘাড়ের ডান দিকে কানের তল ঘেঁষে আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ একটা গভীর ক্ষত চিহ্ন।

ক্ষত চিহ্নের দুপাশে কালো রক্ত শুকিয়ে আছে। নীচু হয়ে মৃতদেহ পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ মৃতের মুষ্টিবদ্ধ ডান হাতটার প্রতি নজর পড়ল কিরীটীর।

মুঠিটা পরীক্ষা করতে গিয়ে ভাল করে দেখা গেল তার ভিতর কি একটা বস্তু যেন চক্ চক্ করছে।

কিরীটী তারপরও আরো কিছুক্ষণ মৃতদেহটা পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াল এবং বলল, চলুন, যে ঘরে ওকে মৃত পাওয়া গিয়েছিল সেই ঘরে চলুন।

অতঃপর সকলে ভৃত্যদের মহলে যে ঘরে করালীচরণ থাকত ও যে ঘরে তাকে নিহত অবস্থায় গতকাল প্রত্যুষে পাওয়া গিয়েছিল সেই ঘরে সকলে এসে প্রবেশ করল—ঘরের দরজায় তালা দেওয়া ছিল, সেই তালা খুলে।

ঘরের মেঝেতে প্রথম দৃষ্টি পড়ে কিরীটীর। ছোট একটা তক্তপোশের সামনে মেঝেতে তখনও চাপ চাপ রক্ত কালো হয়ে শুকিয়ে আছে।

দারোগা সাহেব স্থানটা দেখিয়ে বলেন, ঐখানে করালীচরণকে মৃত পড়ে থাকতে দেখা যায় মিঃ রায়—

কিরীটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার ঘরটার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিল।

ছোট্ট অল্প পরিসর একখানি ঘর। ঘরের মধ্যে মোটমাট দুটি জানালা। জানালার মধ্যে একটা ভিতর থেকে বন্ধ। অন্যটার একটা পাল্লা খোলা—বাকীটা বন্ধ।

জিনিসপত্রের মধ্যে একটা পুরানো ট্রাঙ্ক ও একপাশে একটা বিছানা

তক্তপোশের উপর গোটান অবস্থায় রয়েছে। কিরীটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিক দেখতে লাগল।

কিরীটী দারোগাবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কোথায় ঠিক মৃতদেহ ছিল দারোগা সাহেব?

ঠিক যেখানে দেখছেন মেঝেতে এখনো রক্ত কালো হয়ে জমাট বেঁধে আছে ঐখানেই ছিল—

হুঁ—আচ্ছা ঠিক আছে—এক সেকেণ্ড আমি একটু বাইরে মানে ঐ যে জানালাটা ঘরের বন্ধ আছে সে জায়গাটা বাইরে গিয়ে দেখে আসি।

কথাটা বলে কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে গেল কিন্তু যেখানে যাবে বলেছিল সেখানে গেল না। গেল সোজা যে ঘরে মৃতদেহ রয়েছে সেই দিকে।

কনেস্টবলটা দরজার বাইরে তখনো দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। কিরীটীকে ফিরতে দেখে বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল।

কিরীটী মৃদু একটু হেসে বললে, জেরা মেহেরবাণী করকে কেয়ারী ঠো খোল দিজিয়ে সাব। হামারা একঠো চিজ ঘরকা অন্দরমে গির পড়া।

কনেস্টবল দরজাটা খুলে সরে দাঁড়াল।

কিরীটী ঘরের মধ্যে ঢুকে ক্ষিপ্র হস্তে মৃতের মুষ্টিবদ্ধ হাতের মধ্য থেকে সেই একটু আগে দেখা রঙিন চকচকে বস্তুটি খুলে নিল।

সেটা একটা রঙিন কাঁচের সুদৃশ্য বোতাম।

তাড়াতাড়ি সেটা পকেটে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

কিরীটীকে পুনরায় ঘরে এসে ঢুকতে দেখে দারোগা সাহেব শুধালো, কিছু দেখতে পেলেন?

হ্যাঁ

কি?

একটা কাঁচের বোতাম—

বোতাম! কথাটা বলে দারোগা সাহেব যেন বোকার মতই কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

কিরীটী বলে, চলুন এবার, যা দেখবার দেখা হয়েছে, বাইরে যাওয়া যাক।

চলুন।

সকলে এসে বাইরের ঘরে জমায়েত হলো পুনরায়।

দারোগা সাহেবই এবার প্রশ্ন করে, সব তো দেখলেন, আপনার কি মনে হচ্ছে কিরীটীবাবু?

মনে হচ্ছে ব্যাপারটা হত্যাই—

হত্যা! মৃগাঙ্কমোহন কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ—করালীচরণকে যতদূর মনে হচ্ছে আমার, হত্যাই করা হয়েছে মৃগাঙ্কবাবু। অর্থাৎ আপাততঃ আমার অনুমান তাই।

কিন্তু—মৃগাঙ্কমোহন কি যেন বলতে চায় কিন্তু দারোগা সাহেব বাধা দেয়—

বলে, না মৃগাঙ্কবাবু, এর মধ্যে আর কোন কিন্তু নেই। করালীচরণকে কেউ হত্যাই করেছে আমি তো আগেই আপনাকে বলেছিলাম।

মৃগাঙ্ক বলে, আপনারা বলছেন বটে, কিন্তু আমার এখানো বিশ্বাস হয় না—প্রথমতঃ, কে তাকে হত্যা করবে—আর কেনই বা করবে—দ্বিতীয়তঃ, তার হাতের মধ্যে ভোজালী যে ধরা ছিল সে ব্যাপারটা আপনারা কেউ ভাবছেন না কেন?

কে বললে ভাবছি না—কিরীটী বলে, কিন্তু ক্ষত চিহ্ন দেখে কেউ বলবে না ঐ ভাবে কেউ নিজের গলায় ভোজালী বসাতে পারে। absurd —অসম্ভব।

কিন্তু—

না—মৃগাঙ্কবাবু, করালীচরণ আত্মহত্যা করেনি—তাকে কেউ নিষ্ঠুরভাবে হত্যাই করেছে।

দারোগা সাহেব মাথা দুলিয়ে নিঃশব্দে যেন কিরীটীকে সায় দেয়।

আরো কিছুক্ষণ পরে।

দারোগা সাহেব মৃতদেহ ময়না তদন্ত করবার ব্যবস্থা করে ফিরে গিয়েছেন।

ঘরের মধ্যে মৃগাঙ্কমোহন, সুব্রত ও কিরীটী।

কিরীটী বলে, বেলা সাড়ে তিনটার স্টীমারেই আমি ফিরে যেতে চাই মৃগাঙ্কবাবু।

চলে যাবেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু যে জন্য আপনাকে ডেকে এনেছিলাম সে সম্পর্কে কোন কথাই তো আমাদের হলো না মিঃ রায়।

একটা কথা মৃগাঙ্কবাবু, সত্যি সত্যিই করালীচরণ আত্মহত্যা করেনি—তাকে হত্যা করা হয়েছে জেনেও ব্যাপারটির একটা নিষ্পত্তি চান?

বাঃ! নিশ্চয়ই, সেই জন্যই তো আপনাকে ডাকা—

বেশ—তবে তাই হবে। দু-একদিনের মধ্যেই হয় আবার আমি আসব না হয় কি করছি না করছি খবর আপনি পাবেন।

আপনার পারিশ্রমিকের ব্যাপারটা—

সে একটা স্থির করা যাবে পরে—এখন ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

ফিরবার পথে স্টীমারে কিরীটী বোতামটা হাতের উপর নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল।

সুব্রত হঠাৎ প্রশ্ন করল, তখন কি যেন বলছিলি—বোতাম না কি?

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বলল, হ্যাঁ একটা জামার বোতাম। —এই বোতামটার কথাই বলছিলাম—

কোথায় পেলি?

জানালার বাইরে কুড়িয়ে। বোতামটি বেশ, না সুব্রত?

সত্যই বোতামটা দেখতে ভারী সুন্দর। রঙিন কাঁচের বোতামটা, একদিকে গোল ডিম্বাকৃতি। অন্যদিক চ্যাপ্টা।

সাদা বোতামটার গা থেকে একটা ঈষৎ লালচে আভা ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে।

কি ভাবছিস বলত? সুব্রত জিজ্ঞাসা করল।

কই? কিছুনা।

মৃদু হেসে কিরীটী বোতামটা জামার পকেটে রেখে দিল।

অপরাহ্নের ম্লান আলোয় চারিদিক কেমন যেন বিষণ্ণ মনে হয়।

আকাশে আবার মেঘ করছে।

তিন

পানু ও সুনীল

কিরীটী তখনো বুঝতে পারেনি—করালীচরণের মৃত্যুটা একটা সামান্য দুর্ঘটনা নয়। তার পশ্চাতে একটা কার্যকরণ ছিল।

কিন্তু তার আগে পানু ও সুনীলের ব্যাপারটা জানা দরকার।

পানু আর সুনীল—

রিটায়ার্ড জজ পরমেশবাবুর মেয়ে বিধবা রমার দুটি ছেলে।

পানুর চাইতে সুনীল বছর চারেকের বড় বয়সে।

পানু শান্ত, ধীর।

সুনীল অশান্ত, অধীর।

সুনীলের বয়স, ষোল থেকে আঠারোর মধ্যে হবে। ম্যাট্রিক পাশ করে সে বর্তমানে শ্রীরামপুর কলেজেই আই-এ পড়ছে সেকেণ্ড ইয়ারে। অস্থির, চঞ্চল সুনীল একটি মুহূর্তের জন্যও বাড়ি থাকে না। একটা সাইকেল আছে। সেটায় চড়ে দিবারাত্র টো টো করে কোথায় যে ঘুরে বেড়ায় তা সেই জানে।

আর পানুর বয়স বছর পনের—কিশোর বালক।

সুনীলের গায়ের রঙ ফর্সা—টক্‌টকে একেবারে গোলাপের মত, আর পানু কালো।

কিন্তু সেই কালোর মধ্যেও যেন অপরূপ একটা শ্রী আছে।

অপূর্ব একটা লালিত্য—লাবণ্য।

রোগা লিকলিকে চেহারা সুনীলের। হাওয়ায় হেলে পড়ে। একমাথা রুক্ষ এলোমেলো চুল। সাতজন্ম তেলের সম্পর্ক নেই বললেই চলে। কত রকমের উদ্ভট খেয়ালই যে শ্রীমান সুনীলচন্দ্রের ছোট মাথাটার মধ্যে ঘূর্ণির পাকের মত পাক খেয়ে খেয়ে ফেরে তা সেই জানে।

পানু—স্কুল ছাড়া সর্বক্ষণ প্রায় বাড়িতেই থাকে। নিজের বই-খাতা-পত্র পড়াশুনা নিয়ে ডুবে থাকে।

আর সুনীল—

প্রায়ই সে তার সাইকেল চেপে দু'চার দিনের মত কোথায় যে ডুব দেয়। আবার হয়ত হুট করে একদিন ধুলি ধূসরিত দেহে হাঁপাতে হাঁপাতে আসে ফিরে বাড়িতে।

রমা দুরন্ত খেয়ালী ছেলেটিকে নিয়ে সদাই অস্থির।

মা হয়ত জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় ছিলি সুনু এ দু'দিন।

ঘুরে এলাম মা মণি, ঘুরে এলাম সাইকেলে আসানসোল, ধানবাদ, upto কাত্রাসগড়।

কী যে তোর খেয়াল সুনু? মা বলেন, একটা আপদ বিপদ না ঘটিয়ে আর তুই ছাড়বিনে দেখছি। দেখত পানু কত স্থির, কত ধীর।

আর কি রক্ষা আছে? অমনি হাত পা নেড়ে সুনীল বক্তৃতা শুরু করে দিল। জান মা, আমাদের বিশ্বকবি কি বলেছেন?

"দেশ দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে,
বেঁধে বেঁধে রাখিওনা ভাল ছেলে করে।

শীর্ণ-শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে
দাও সবে গৃহ ছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে।
সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী
রেখেছো বাঙালী করে মানুষ করোনি।"

বুঝলে? ওগো আমার জননী, বুঝলে কিছু।

মা মুখটাকে গম্ভীর করে বললেন, জানিনে বাপু তোদের বিশ্বকবি টবি। যেমন হয়েছে ছেলেগুলো, তেমনি হয়েছে সব কবিতা। যা ইচ্ছা করগে যা।

সুনীল হাঃ হাঃ করে মার কথায় হেসে ওঠে। তারপর একসময় মার দিকে আব্দারের সুরে বলে, কিন্তু খিদে যে বড্ড পেয়েছে মা শীগ্‌গিরী কিছু খেতে দাও।

মা আবার খাবার আনতে গেলেন।

সুনীল ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে গুণ গুণ করে গান গাইতে থাকে।

"কেন পান্থ এ চঞ্চলতা?
কোন্ শূন্য হ'তে এলো কার বারতা।"

শান্ত পানু হয়ত তখন তার নিজের ঘরে বসে বইয়ের মধ্যে ডুবে আছে।

এবারে ও প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবে।
খুব ভাল ছেলে পানু লেখায় পড়ায়।
মাস্টারদের অনেক আশা ওর উপর।

সুনীল এসে পানুর ঘরের মধ্যেই যেন একটা দমকা হাওয়ার মতো ঢুকে পড়ে।

তারপর পানুর মাথাটা ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বলে ওঠে, দেখ পানু, তুই একটা প্রকাণ্ড ফুলস্টপ। একটা দাঁড়ি, একটা পরিপূর্ণ পূর্ণচ্ছেদ। এই অনন্ত জীবন—দিকে দিকে যার হাতছানি—এ তোকে বিচলিত করেনা? মাথার

উপর সীমাহীন ঐ সুনীল আকাশ—অসীম থেকে ভেসে ভেসে আসে পাখীর কলগীতি। এ-সবের কোন মূল্য তোর কাছে নেই? কি রে তুই—

পানু সুনীলকে অত্যন্ত ভালবাসে, ওর মুখের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসে।

সুনীল বলে চলে, অদেখা সমুদ্রের ডাক তোর কানে পৌঁছায় না? সীমাহীন মরু তোর প্রাণে স্বপ্ন জাগায় না? তুই একটা মানুষ!

পানু দাদার কথায় হাসে—বলে, তবে কি দাদা?

তুই, তুই মার একটা ছোট্ট খোকন মণি সোনা। তোমায় কে মেরেছে ঠোনা। আদর করে চুমো দেবো, গড়িয়ে দেবো দানা।

মা এসে ঘরে ঢোকেন। সুনু আবার পানুর মাথা খাচ্ছিস। নিজের তো খেয়ালের অন্ত নেই, আবার ওকে নাচাস কেন?

ভয় নেই মা। তোমার ও money bagটি লুট করব না। বলতে বলতে স্যাণ্ডেল ফট্ ফট্ করতে করতে সুনীল দরজার বাইরে পা বাড়ায়।

আবার এই অবেলায় কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি? মা বলেন। খাবার আনতে বললি—

এখন নয় মা—এখন নয়, একটু ঘুরে আসছি—বলতে বলতে সুনীল অদৃশ্য হয়।

কাল থেকে কলেজে গ্রীষ্মের ছুটি শুরু।

সকালবেলা উঠে চেয়ারে বসে টাইমটেবলটা খুলে সুনীল আপন মনে পাতা উল্টে চলেছে, এই লম্বা ছুটিটায় কোথায় কোথায় যাওয়া যেতে পারে? কতদূর পর্যন্ত? পেশোয়ার গেলে মন্দ হত না। তবে একটু বেশী দূর এই যা।

একপাশে বসে পানু কী একটা বই পড়ছে।

জলখাবারের প্লেট হাতে মা এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

সকাল বেলাতেই টাইম টেবল নিয়ে বসেছিল কেন?

সুনীল গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল—

জননীগো, অনেক চিন্তার পর এই স্থির করি,
সুদূর পেশোয়ার বারেক আসিব ঘুরি।

রমা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল, না, না—ওসব মতলব ছাড়—সামনের বছর না তোর পরীক্ষা—

জানি—পরীক্ষা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে কিন্তু জীবনের এই মুহূর্তগুলো একবার গেলে আর আসবে না। বাধা দিও না জননী— প্রসন্ন মনে বলো, যাও—পুত্র—পেশোয়ায়—যাও।

রমা বলেন, না—

সুনীল বলে, হ্যাঁ—

পানু মৃদু মৃদু হাসে।

চার

অদ্ভুত চিঠি

দিন দুই পরের কথা।

দুপুরের দিকে কিরীটী তার শয়ন ঘরে চুপচাপ বসে আছে।

দু'আঙ্গুলের ফাঁকে ধরা একটা জ্বলন্ত সিগ্রেট।

জংলী এসে ঘরে ঢুকলো, বাবু একটা চিঠি।

জংলী, এককাপ চা আন তো। কিরীটী চিঠিটা হাতে নিতে নিতে বলে।

জংলী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

চিঠিখানি উল্টে পাল্টে কিরীটী দেখতে লাগল। চিঠির উপরে ছাপ বড়বাজার পোস্ট অফিসের।

সযতনে খাম ছিঁড়ে কিরীটী চিঠিটা টেনে বের করলে।

চিঠিটা ইংরাজীতে টাইপ করা।

চিঠিটা পড়তে পড়তে ঘন অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা আশার আলোর হঠাৎ ঝলকানি দেখতে পায়।

একবার দুবার তিনবার চিঠিটা পড়ল, তারপর প্রসন্ন মনে, চিঠিটা সযতনে পকেটে ভাঁজ করে রেখে কিরীটী চিন্তা সাগরে ডুব দিল।

জংলী এসে চা দিয়ে গেল, কোন খেয়াল নেই। হাতের সিগ্রেটটা শুধু মুখের কাছে তুলে নিয়ে মাঝে মাঝে টান দিচ্ছে।

সুব্রত এসে ঘরে প্রবেশ করল। কি একটা বলতে গিয়ে সহসা কিরীটীর দিকে নজর পড়তেই চুপ করে গেল। সে জানত কিরীটী যখন চিন্তা করে তখন হাজার ডাকলেও সাড়া পাওয়া যায় না, অতএব সে একটা সোফায় বসে সেদিনকার দৈনিক'টায় মন দিল।

একসময় কিরীটীরই খেয়াল হতে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে সুব্রত--কতক্ষণ—

অনেকক্ষণ—তারপর শ্রীপুর হত্যা রহস্যের কোন আলোক সম্পাত হলো—

আলোক সম্পাত?

হ্যাঁ—

না—তেমন কিছু না, তবে একটা চিঠি পেয়েছি কিছুক্ষণ পূর্বে।

চিঠি!

হ্যাঁ—

সুব্রত প্রশ্ন করে, কার চিঠি?—

শোন—

কিরীটী পকেট থেকে চিঠিটা বের করে খুলে পড়তে লাগলো—ইংরাজীতে লেখা, তবে চিঠিটার বাংলা তর্জমা করলে এই দাঁড়ায়।—

প্রিয় কিরীটীবাবু—

শুনলাম আপনি শ্রীপুরের চৌধুরী বাড়ির পুরানো ভৃত্য করালীর হত্যা রহস্যের মীমাংসার ভার নিয়েছেন। সেই কারণেই কর্তব্য বোধে আপনাকে কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথা জানাতে চাই ঐ চৌধুরী বাড়ি সম্পর্কে। অর্থাৎ এই চৌধুরী পরিবার সম্বন্ধে।

জমিদার অনঙ্গমোহন চৌধুরীর একমাত্র পুত্র হচ্ছে শ্রীপুরের বর্তমান জমিদার শশাঙ্কমোহন চৌধুরী। অনঙ্গ চৌধুরীর জীবিতকালে তাঁর পুত্র শশাঙ্কমোহনের কোন সন্তান হয়নি—যাই হোক অনঙ্গ চৌধুরীর মৃত্যুর পর তার উইলে দেখা গেল—লেখা আছে—তাঁর মৃত্যুর পর মানে অনঙ্গ চৌধুরীর মৃত্যুর পর যদি শশাঙ্কমোহনের ছেলে হয় তবে তার সমস্ত সম্পত্তি সেই ছেলে পাবে। আর ছেলে না হয়ে যদি মেয়ে হয় তবে তার মৃত্যুর পর অর্ধেক সম্পত্তি পাবে সেই মেয়ে আর বাকী অর্দ্ধেক পাবে তার খুল্লতাত পুত্র মৃগাঙ্কমোহন বা ঐ মৃগাঙ্কমোহনের পুত্র বা তাঁর পরবর্তী ওয়ারিশগণ। সে আজ ১৮ বছর আগের কথা।

তারপর সবাই জানল অনঙ্গমোহনের মৃত্যুর দু-বছর পরে শশাঙ্কমোহনের একটি কন্যা সন্তান জন্মাল অর্থাৎ ঐ শ্রীলেখা। কিন্তু আমি জানি আসল সত্য তা নয়, শশাঙ্কমোহনের ছেলেই একটি জন্মেছিল আজ থেকে ষোল বছর আগে এক দুর্যোগের রাত্রে এবং আতুড় ঘরেই শশাঙ্কমোহনের নবজাত পুত্র চুরি যায়। এবং যারা চুরি করে তারাই সেই ছেলের বদলে মেয়েকে রেখে যায়। আপনার কাছে আমার এই অনুরোধ যে, সেই চুরি যাওয়া ছেলেকে আপনার খুঁজে বের করে দিতে হবে এবং যদি বের করে দিতে পারেন বা বর্তমানে সে কোথায় আছে সে সন্ধানটুকুও এনে দিতে পারেন তাহলে আপনাকে নগদ দশ হাজার টাকা দেবো। আপনি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত থাকেন তাহলে দয়া করে আপনার বাড়ির দরজায় 'হ্যাঁ' অক্ষরটি খড়ি দিয়ে লিখে রাখবেন এবং আমি আপনাকে পরদিনই পারিশ্রমিকের পাঁচ হাজার টাকা অগ্রিম পাঠিয়ে দেবো। বাকী কার্য উদ্ধারের পর পাবেন।

একটা কথা—জন্মের সময় শিশুর ডান ভ্রুর ঠিক উপরেই একটা লাল জরুল (১ ইঞ্চি পরিমাণ) ছিল।

আমি কে, তার পরিচয় আপনাকে আমি দিতে চাইনা। শুধু জেনে রাখুন আমি চৌধুরীদের একজন পরম শুভাকাঙ্খী—বর্তমানে কোন কারণে পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক। নমস্কার,

ইতি 'অপরিচিত'

চিঠিটা পড়ে শেষ করল কিরীটী।

আশ্চর্য তো ! সুব্রত বলে।

এখন দেখছিস করালীর হত্যা ব্যাপার যতখানি সহজ ভেবেছিলাম আসলে ঠিক ততখানি নয়। মানে অগাধ জল। কিরীটী হাসতে হাসতে বললে।

চিঠিটার ওপরে পোস্ট অফিসের ছাপটা কোথাকার?

সুব্রতর প্রশ্নের জবাবে কিরীটী বলে, আছে অবিশ্যি একটা পোস্ট অফিসের ছাপ কিন্তু তাতে তার কোন মুশকিল আশান হবে না—

কেন?

কারণ যে অতখানি সতর্কতা অবলম্বন করতে পেরেছে, ওটুকু বুদ্ধি তার কাছে থেকে আমি আশা করি।

তারপর একটু থেমে বলে, চিঠিতে বড়বাজার পোস্ট অফিসের ছাপ রয়েছে—কিন্তু অপরিচিত বন্ধু আমার যত চালাকিই খেলুন গলদ একটু বেরিয়ে পড়েছে। তবে তার জন্য তাকে দোষ দিই না। মানুষ সব সইতে পারে, পারে না শুধু সইতে নিজের স্বার্থে আঘাত। তখন তার হিতাহিত জ্ঞানটুকু পর্যন্ত লোপ পেয়ে যায় এমন দৃষ্টান্তেরও এ-দুনিয়ায় অভাব নেই।

সুব্রত এবারে প্রশ্ন করে, কে ঐ চিঠিটা লিখেছে বলে তোর মনে হয় কিরীটী?

নিঃসন্দেহে কোন interested party অর্থাৎ যার এ ব্যাপারে স্বার্থ রয়েছে। এবং সে হয়ত স্বার্থ থাকলেও কোন কারণে সামনা সামনি এসে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু সে যাই হোক—করালীচরণের ব্যাপারটা যে হত্যাই সেটাও যেমন এখন সুনিশ্চিত বলে মনে হচ্ছে তেমনি সেই হত্যার মূলে একটা গভীর রহস্যও আছে বলে মনে হচ্ছে।

তা হলে?

অতঃপর কিরীটী সুব্রতর দিকে তাকিয়ে বললে, ব্যাপারটা একটু বেশী রকম প্যাঁচ খেয়ে গেল আর সেই প্যাঁচ খুলতে একটু বেগ পেতে হবে। তা হোক, তার জন্য আমি ভয় পাইনা। আপাততঃ অপরিচিত বন্ধুটির কথাই সত্যি বলে মেনে নিয়ে আমরা কাজে অগ্রসর হবো।

কিভাবে শুরু করবি ভাবছিস?

কালই জলে নেমে প্রথম ডুব দেবো। দেখি কতদূর কি হ'ল?

সুব্রত হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করল, কোথাকার জলে? সাগরের, না গঙ্গার?

কিরীটী হেসে ফেললে, না ভাই সাগরের জলে ডুব দিতে সাহস নেই। শোনা যায় তার নাকি তল নেই। আর মা গঙ্গা? অত পুণ্যি কি আর আমার মত পাপীর সইবে? তার চাইতে দেখি শ্রীপুরের এঁদো পুকুরে একটা ডুব দিয়ে। ধনরত্ন না মিলুক দু'চারটে শামুক বা গুগ্‌লি—ও তো হাতে ঠেকতে পারে।

দেখিস, শেষে কাদা ঘাঁটাই যেন না সার হয়।

দেখি।

ইতিমধ্যে মৃগাঙ্কমোহনের তার পেয়ে জমিদার শশাঙ্ক চৌধুরী শিলং থেকে শ্রীপুরে ফিরে এসেছিলেন।

পাঁচ

কবুলতি

দ্বিপ্রহরে শশাঙ্ক চৌধুরী সাধারণতঃ তাঁর প্রাইভেট রুমে বসে স্টেটের যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশুনা করেন। সে সময়টা সাধারণতঃ বড় একটা কারো সঙ্গে তিনি দেখাশুনা করেন না।

একান্ত প্রয়োজনীয় হলে অবিশ্যি আলাদা কথা।

করালীর মৃত্যুর দিন চারেক পরে।

সে দিনও দুপুরে যখন তিনি প্রাইভেট রুমে বসে কাগজপত্র দেখাশুনা করছিলেন, এমন সময় চাকর মধু এসে জানাল একজন পুলিশের লোক কি একটা বিশেষ জরুরী কাজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান, এখুনি।

শশাঙ্কমোহন বললেন, তাঁকে আমার বসবার ঘরে বসাগে যা, আমি আসছি।

অশোক পাশেই একটা চেয়ারে বসে শশাঙ্কমোহনকে কি আবশ্যকীয় কাগজপত্র বুঝিয়ে দিচ্ছিল, শশাঙ্কমোহন ওর দিকে তাকিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি একটু অপেক্ষা কর অশোক। দেখে আসি পুলিশ আবার কেন এলো এ সময়—

একজন ছাব্বিশ সাতাশ বৎসর বয়সী যুবক—ব্যাক ব্রাস করা মাথার চুল, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি। সরু বাটার ফ্লাই গোঁফ।

চোখে কালো কাঁচের চশমা। সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবী পরা। ড্রয়িং রুমে একটা সোফার উপর ঠেস দিয়ে বসে সেদিনকার খবরের কাগজটা পড়ছিল। শশাঙ্কমোহনের জুতোর আওয়াজ পেয়ে কাগজটা নামিয়ে মুখ তুলে তাকাল।

শশাঙ্কমোহন হাত তুলে নমস্কার করে বললেন,

আপনি?

আমারই নাম শশাঙ্ক চৌধুরী।

নমস্কার, আমি সি, আই, ডি থেকে আসছি, করালীচরণের হত্যার ব্যাপারে কয়েকটা কথা আমাদের জানা দরকার—

বলুন, কি কথা?

আপনি বসুন। দেখুন, বলছিলাম কি, কথাটা একটু গোপনীয়, এ ঘর.....

আচ্ছা আসুন, আমার অফিস রুমে চলুন।

শশাঙ্কমোহনের পিছু পিছু আগন্তুক ভদ্রলোক দোতালায় নিজের অফিস ঘরে এসে ঢুকলেন। ঘরে প্রবেশ করে শশাঙ্কমোহন অশোককে ইঙ্গিতে ঘর ছেড়ে যেতে বললেন। অশোক ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

ঘরটাকে সত্যিই নির্জন বলা যেতে পারে।

ঘরটা আকারে মাঝারি রকমের হবে।

ঘরের একটি মাত্র দরজা।

ঘরের নীচেই বাগান। সেই দিকে গোটা দুই জানালা। জানালায় সবুজ পর্দা ঝোলান।

ঘরের মধ্যে একটা গোল টেবিল। টেবিলের এক পাশে ফোন। গোটা দুই চেয়ার ও গোটা চারেক আলমারী। প্রত্যেকটি আলমারী ঠাসা ইংরাজী বাংলা সব বই।

ইঙ্গিতে একটা চেয়ারে বসতে বলে, নিজে অন্য চেয়ারটা অধিকার করে শশাঙ্কমোহন বললেন, এইবার বলুন আপনার কি জিজ্ঞাস্য।

ভদ্রলোক শশাঙ্কমোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, বুঝতেই পারছেন আপনাদের পুরানো ভৃত্য করালীচরণের হত্যার ব্যাপারে এখানে আমি এসেছি। তাই চৌধুরী বাড়ির পুরাতন ইতিহাস আমার কিছু জানা দরকার। তারপর একটু থেমে বললেন, আচ্ছা একথা কি সত্যি যে আজ থেকে ষোল বছর আগে আপনার পিতা অনঙ্গ চৌধুরী মশাই মারা যাওয়ার পর তাঁর উইলে জানা যায় আপনার কোন পুত্র সন্তান না হলে সম্পত্তির অর্ধেক মাত্র আপনি পাবেন এবং বাকী অর্ধেক আপনার খুল্লতাত ভাই মৃগাঙ্কবাবু পাবেন?

কোথা থেকে জানলেন কথাটা। বিস্ময়ে যেন হতবাক শশাঙ্কমোহন।

জেনেছি—সত্যি কিনা বলুন।

সত্যি—কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি একান্ত গোপনীয়, ঐ ব্যাপারটা যা একমাত্র আমি ছাড়া কেউ জানে না, সে কথাটা আপনি কোথা থেকে কেমন করে জানলেন।

ভদ্রলোক মৃদু হাসলেন। আমরা যে অনেক কিছুই জানতে পারি—জানতে আমাদের হয়, নচেৎ এই খুন-জখম ইত্যাদির রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করবো কি করে।

অতঃপর শশাঙ্কমোহনকে মনে হলো যেন বেশ একটু চিন্তিত।

যাক্ সে কথা, আচ্ছা আপনি বলছেন কথাটা কেউ জানে না—মৃগাঙ্কবাবুও কি জানেন না?

জানে না বলেই তো এতকাল ধারণা ছিল কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—

কি—বলুন?

না, কিছু না।

মিঃ চৌধুরী—

বলুন।

আপনার পিতার মৃত্যুর দু-বছর পরে আপনার সন্তান হয়, তাই না?

হ্যাঁ—

আর সে সন্তান কি সত্যিই একটি মেয়েই হয়েছিল?

হ্যাঁ—শ্রীলেখা আমার মেয়ে—

কিন্তু, আমি যদি বলি—

কি?

ঐ শ্রীলেখা আপনার সন্তান আদৌ নয়—

মানে! চম্‌কে শশাঙ্কমোহন আগন্তুকের মুখের দিকে তাকান।

তার মানে মেয়ে নয়, আসলে হয়েছিল আপনার একটি পুত্র সন্তান এবং জন্ম মুহূর্তে সে অপহৃত হয়েছিল এবং আজো সে বেঁচে আছে বলেই আপনি জানেন।

শশাঙ্কমোহন সত্যিই একেবারে স্তম্ভিত—নির্বাক! আজ দীর্ঘ ষোল বছর ধরে যে কথা কেউ জানে না—সেই কথাটা কি করে ঐ ভদ্রলোক জানতে পারলেন।

ধীরে ধীরে এক সময় আবার ভদ্রলোক মুখ তুললেন। বললেন, বুঝতে পারছি আমরা যা জেনেছি তা মিথ্যা নয়, সত্যি—

না, মিথ্যা নয়—সত্যি —সব সত্যি—

ভদ্রলোক আবার বললেন, হয়ত এ ভালই হলো মিঃ চৌধুরী—আপনার যে পুত্র সন্তান হয়েছিল এবং যে পুত্র সন্তানকে কেউ না কেউ চক্রান্ত করে তার জন্মের পর তার মায়ের বুক থেকে তাঁর অজ্ঞাতে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং আজও যখন সে জীবিত তাকে হয়ত আবার আমরা খুঁজে বের করতে পারব—কিন্তু আমি ভাবছি একটা কথা আপনি যদি জানতেনই ব্যাপারটা তো—পুলিশের সাহায্য নেন নি কেন—কেন এতদিন চুপ করে মুখ বুঁজে আছেন—

তারা—তারা আমায় ভয় দেখিয়েছিল—

ভয়!

হ্যাঁ—বলেছিল যদি তাকে খোঁজ করবার কোন রকম চেষ্টা করি তো —তারা তাকে হত্যা করবে। তাই—তাই পারিনি—পাছে তাকে জন্মের মত হারাতে হয় বলে—বলতে বলতে শশাঙ্কমোহন যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

আচ্ছা মিঃ চৌধুরী—আপনার স্ত্রী—আপনার স্ত্রী জানেন কথাটা?

না।

জানেন না তাহলে তিনি?

না।

ঠিক আছে। এবারে আমি আজকের মত উঠবো শশাঙ্কবাবু—

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।

ছয়

শশাঙ্কমোহনের চিন্তা

একটা কথা, আপনি—আপনি পরিচয় দিলেন আপনি পুলিশের লোক—আপনার নামটা—শশাঙ্কমোহন প্রশ্ন করলেন।

আমার নাম—ধুর্জটী প্রসাদ রায়—

ধুর্জটী বাবু, একটা কথা আপনাকে আমি সত্যি বলিনি—

কি কথা?

আমার সেই অপহৃত ছেলের খোঁজ করিনি—কথাটা সত্য নয়—আর—

আর—

আর আসল ব্যাপারটা আমি জানতে পারি মাত্র চার বৎসর আগে—তার আগে কিছুই জানতাম না।

কেমন করে জানলেন?

একটা উড়ো অজ্ঞাতনামা লোকের চিঠিতে—

তারপর?

সেই চিঠিতেই লেখা ছিল যেন সে ছেলের খোঁজ আমি না করি। তবু—তবু— আমি খোঁজ না করে তাকে পারিনি—এবং—

বলুন, থামলেন কেন?

খুঁজতে খুঁজতে জানতে পারি হরমোহিনী অনাথ আশ্রমে সে গোত্র পরিচয়হীন—সুধীর নামে যে ছেলেটি রয়েছে সেই ছেলেটি—

তারপর।

খোঁজ পেলেও কি করব ঠিক করতে তখনো পারছিলাম না—পত্র প্রেরক যেরকম ভয় দেখিয়েছে যদি সত্যি সত্যিই ছেলেকে আমার হত্যা করে—তাছাড়া—সমস্ত প্রমাণাদি তখনো জোগাড় করে উঠতে পারি নি—এবং ঠিক সেই সময়—

কি?

একদিন লোভ সম্বরণ করতে না পেরে যখন তাকে একটিবার দেখবার জন্য হরমোহিনী আশ্রমে গিয়ে হাজির হলাম—শুনলাম—

বলুন—

মাত্র কয়েকদিন আগে এক রাত্রে নাকি অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে সেই ছেলেটি আশ্রম থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই থেকে কত জায়গায় কত

ভাবেই না চারবছর ধরে আমার সেই হারান ছেলের খোঁজ করেছি। কিন্তু তার সন্ধান পেলাম না আজ পর্যন্তও। শশাঙ্কমোহনের কণ্ঠস্বর শেষের দিকে যেন অশ্রুভারে জড়িয়ে আসে।

আশ্রম থেকে ছেলে অদৃশ্য হয়ে গেল। এতো ভারী আশ্চর্য ব্যাপার, আচ্ছা আশ্রম থেকে সেই ছেলে যখন অদৃশ্য হয়ে যায় তখন তার বয়স কত ছিল?

বার বছর। শশাঙ্কমোহন উত্তর দিলেন।

আচ্ছা সেই হারিয়ে যাওয়া ছেলে সংক্রান্ত কোন পরিচয়ের নিশানা কি আপনার কাছে আছে? ভদ্রলোক প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ আছে, ঐ আশ্রমেই পাওয়া। আশ্রমের ছেলেদের একটা গ্রুপ ফটো, তার মধ্যে ঐ ছেলেটিরও ফটো ছিল। সেটা আমি আলাদা করে এনলার্জ করে রেখে দিয়েছি। খুঁজবার সুবিধা হবে বলে। তাছাড়া ছেলেটির গায়ের রং ফর্সা। ডান ভ্রুর ঠিক উপরেই একটা লাল জরুলের চিহ্ন আছে। রোগা ছিপছিপে গড়ন।

কিন্তু একটা কথা। এই ছেলেই যে আপনার সেই হারিয়ে যাওয়া ছেলে তার আর কোন সঠিক প্রমাণ পেয়েছেন কি?

এ্যাঁ, তা হ্যাঁ। মানে আমার ছেলে যেদিন জন্মায় সেইদিন ও আশ্রমে সুধীরের যে জন্ম তারিখ দেওয়া ছিল, সে দুটোই একই দিন। আর তা ছাড়া যারা যড়যন্ত্র করে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন....।

ভদ্রলোক শশাঙ্কমোহনের মুখের কথাটা একপ্রকার প্রায় লুফে নিয়েই হাসতে হাসতে বললেন, আপনাদের.. আচ্ছা একটা কাগজ দিন তো, বলে ভদ্রলোক শশাঙ্কমোহনের মুখের দিকে তাকালেন।

শশাঙ্কমোহন একান্ত বিস্মিত হয়েই একখণ্ড স্লিপ পেপার ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে দিলেন।

টেবিলের উপর থেকে শশাঙ্কমোহনের খোলা ঝর্ণা কলমটা তুলে নিয়ে ভদ্রলোক খস্ খস্ করে কি একটা লিখে শশাঙ্কমোহনের দিকে এগিয়ে ধরলেন তাঁর চোখের দৃষ্টির সামনে।

শশাঙ্কমোহন বিস্ময়ে যেন একেবারে থ' হয়ে গেছেন।

এ শুধু অভাবনীয়ই নয়, একেবারে যাকে বলে অচিন্ত্যনীয়।

তিনি নীরবে পলকহারা দৃষ্টিতে সেই স্লিপ কাগজটার গায়ে কালি দিয়ে লেখাটার দিকে তাকিয়েই রইলেন।

সত্যই তিনি যেন বোবা হয়ে গেছেন। লোকটা কি অন্তর্যামী? না যাদুবিদ্যা জানে?

ভদ্রলোক শশাঙ্কমোহনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, নমস্কার, এবার উঠবো, বলতে বলতে ভদ্রলোক নিঃশব্দ ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

ধীরে ধীরে জুতোর শব্দ বারান্দায় মিলিয়ে গেল।

ভদ্রলোক ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরও শশাঙ্কমোহন একইভাবে স্থানুর মতই বহুক্ষণ চেয়ারটার উপর বসে রইলেন।

ইতিমধ্যে অশোক এসে একবার পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতরে উঁকি দিয়ে গেল।

মনে হলো শশাঙ্কমোহন কী যেন একটা বিষয় গভীরভাবে ভাবছেন।

সহসা একমসয় শশাঙ্কমোহন চেয়ার ছেড়ে উঠে আগে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যস্থলে রক্ষিত একটা বইয়ের আলমারী চাবি দিয়ে খুলে সাজান বইগুলির পিছনে কী যেন অতি ব্যস্ততার সঙ্গে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে লাগলেন।

বোধ হল, যা তিনি খুঁজছিলেন তা পেলেন না। একে একে আলমারীর প্রত্যেকটি সেলফ থেকে সাজান বইগুলি মাটিতে নামিয়ে আরো ভাল করে খুঁজতে লাগলেন। ক্রমেই তাঁর সমস্ত মুখের রেখাগুলি গভীর চিন্তায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। চোখের দৃষ্টি সন্দিগ্ধ ও খর সন্ধানী। একে একে শশাঙ্কমোহন আলমারীর সমস্ত তাকগুলিই খুঁজলেন।

কিন্তু তাঁর অভীষ্ট বস্তুর কোন সন্ধানই মিলল না।

একে একে তিনি ঘরের তিনটি আলমারীই তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। সহসা তাঁর কণ্ঠ দিয়ে গভীর হতাশার একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল। আশ্চর্য, সেই খামটা উড়ে গেল নাকি? হঠাৎ ঐ সময় শশাঙ্কমোহনের নজরে পড়ে বন্ধ দরজায় কি-হোলের সরু ছিদ্রপথ দিয়ে একটা সরু সূর্যের আলোর রশ্মি ঘরের কার্পেটটার উপর পড়েই আবার মিলিয়ে গেল। আবার আলোটা দেখা গেল একটু পরেই। শশাঙ্কমোহন চিন্তিত মনে সেদিকে তাকিয়ে আলোর রশ্মিটাকে অনুসরণ করে দরজার দিকে নজর করতেই কী একটা সন্দেহ যেন তাঁর মনে চকিতে উঁকি দিয়ে গেল। আলোটা তখন আর দেখা যাচ্ছে না। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, কে?

সহসা আলোটা আবার ঘরের মধ্যে জেগে উঠল। এবং পরক্ষণেই বাইরের বারান্দায় যেন কোন লোকের দ্রুত পলায়ণের শব্দ শোনা গেল।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ল্যাচ্‌কি-টার চাবি ঘুরিয়ে একটান দিয়ে দরজাটা খুলে ফেললেন।

বৈকালের পড়ন্ত রোদ টানা বারান্দাটায় রেলিংয়ের কোল ঘেঁষে সার বাঁধা টবে সাজান পামট্রি-গুলির সরু চিকন পাতার গায়ে শেষ পরশটুকু বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল।

বারান্দাটা একেবারে খালি। ত্রিসীমানাতেও কাউকে চোখে পড়ল না।

নির্জন বারান্দাটা একেবারে খাঁ খাঁ করছে। সাধারণতঃ দোতালার এদিকটা নির্জন। লোকজনের যাতায়াত নেই। অন্দর মহলের সঙ্গে এদিকটার কোন যোগাযোগ নেই।

বাইরে থেকে সিঁড়ি দিয়ে এদিকে আসা যায়। কিন্তু কি আশ্চর্য।

শশাঙ্কমোহন বারান্দা দিয়ে এগিয়ে চার পাশে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখে এলেন। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। মানুষ তো দুরের কথা, একটি ছায়া পর্যন্ত নয়। —অথচ একথা সত্য যে 'কি-হোলের' ছিদ্রপথ দিয়ে নিশ্চই কেউ শশাঙ্কমোহনের কাজ গোপনে লক্ষ্য করছিল। কিন্তু কে সে? কার এতবড় বুকের পাটা স্বয়ং কর্তার ঘরে এমন করে লুকিয়ে আড়ি পাতে? কে? কে?

সাত

নতুন চাকর

জমিদার শশাঙ্কমোহন চৌধুরীর সংসারে আপনার জনের মধ্যে স্ত্রী—একমাত্র মেয়ে শ্রীলেখা ও তাঁর খুল্লতাত ভাই মৃগাঙ্ক। শ্রীলেখার বয়স ১৬ বছর।

শ্রীলেখা স্কুলে পড়ে—এক বছর পরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবে। যুঁই, হেনা, রমা, টুনি—ওর এখন কত বন্ধু। বড় লোকের মেয়ে হলে কি হয়। মনে কিন্তু ওর এতটুকু অহঙ্কার নেই।

যেমনি মিশুকে তেমনি হাসিখুশি।

সকলেই ওর ব্যবহারে ভারি সন্তুষ্ট।

ওর সব চাইতে প্রিয় বান্ধবী হচ্ছে যুঁই। যুঁই গরীবের মেয়ে, ত্রিসংসারে ওর একমাত্র বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই।

ওর মা স্থানীয় মেয়ে। স্কুলে সেলাইয়ের কাজ শিখিয়ে যে কয়টি টাকা পান তাইতেই ওদের সংসার, মা আর মেয়ের কোন মতে চলে যায়।

স্কুলে যেদিন শ্রীলেখা প্রথম যায় সেই দিনই যুঁইয়ের সঙ্গে ওর ভাব হয়।

রোগা ছিপ্ ছিপে গড়ন কালো মেয়েটি। মাথা ভর্তি চুল।

বড় বড় ভাসা ভাসা দুটো চোখ। সর্বদাই যেন তাতে জল ভরে আছে। হাতে একগাছি করে সোনার চুড়ি।

শ্রীলেখা নিজেই এসে ওর সঙ্গে আগে কথা বলে, কি নাম তোমার ভাই।

যুঁই তার ডাগর দুটি চোখ তুলে বিস্মিত হয়ে শ্রীলেখার দিকে তাকায়।

কি সুন্দর শ্রীলেখার চেহারা। তার উপরে দামী শাড়িতে শ্রীলেখাকে ভারী মানিয়েছিল। মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে দেখে মৃদু হাসিতে ঠোঁট দুটি ভরিয়ে শ্রীলেখা জিজ্ঞাসা করল, কি দেখ্ছো?

তোমাকে—মৃদু সঙ্কোচভরা কণ্ঠে যুঁই জবাব দেয়।

আমাকে? কেন? আমার বুঝি দুটো মাথা, চারটে চোখ?

না তা তো নয়, কিন্তু তোমার নাম কি ভাই?

শ্রীলেখা—তোমার নাম?

আমার নাম যুঁই।

যুঁই? বা, ভারি সুন্দর নামটি তো তোমার।

আর তোমার! যুঁই হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করল।

তোমার নামের মত তাই বলে সুন্দর নয় মিষ্টি নয়।

একদিন শ্রীলেখা এক প্রকার জোর করেই যুঁইকে নিজেদের বাড়ি ওদের বাড়ির গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে গেল।

ধনী গৃহে ঐশ্বর্যের অফুরন্ত সমারোহ। যুঁই বিস্ময়ে হাঁ করে চারিদিক চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

মস্ত বড় প্রকাণ্ড বাড়ি।

ঘরে ঘরে সব কার্পেট পাতা। দেওয়ালে দেওয়ালে দামী দামী সব বিখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা সুন্দর সুন্দর ছবি।

ঘরের কোণে টিপয়ে রাখা কাশ্মীরি টবে পামট্রি। শ্রীলেখার পড়বার ঘরটিই বা কি সুন্দর। একধারে একটি দামী টেবিল, তাতে শ্রীলেখার পড়বার বইগুলি ইতস্ততঃ ছড়ানো, টেবিলের উপর ফুলদানীতে এক গোছা রজনীগন্ধা, দেওয়াল আলমারী ঠাসা সব গল্পের বই ও ছবির বই; পাশেই শোবার ঘর। দামী পালঙ্কে দুধের মত সাদা ধবধবে পাখীর পালকের মত নরম বিছানা।

দামী শ্বেত পাথরের প্লেটে করে নানা রকমের খাবার সব সাজিয়ে নিয়ে এল। যুঁই জীবনে এমন সুস্বাদু ও সুগন্ধযুক্ত খাবার আস্বাদনের সুযোগ একেবারে পায়নি বললেও চলে।

শ্রীলেখার মা বিভাবতীও এসে যুঁই এর সঙ্গে আলাপ করলেন। যেমন অমায়িক তেমনি হাসিখুশি।

এরপর একদিন শ্রীলেখা নিজে যেচে স্কুলেব ছুটির পর যুঁইয়ের বাড়িতে গেল।

দুখানি মাত্র ঘর নিয়ে যুঁইদের সংসার।

একখানায় যুঁই ও তার মা রাত্রে শোন ও যুঁই পড়াশুনা করে। অন্যটায় ওদের গৃহস্থালী ও রান্না খাওয়া দাওয়া হয়।

গোছগাছ ফিটফাট, কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা নেই। ছোট্ট একখানি কেরোসিন কাঠের টেবিল। তার উপরে সযত্ন পরিপাটি করে যুঁইয়ের পডবার বই ও খাতাপত্র সাজান গুছান।

সামনেই যুঁইয়ের বাবার ফটো।

কী সৌম্যমূর্তি।

যুঁই হাসতে হাসতে বললে, গরীব বান্ধবী। তোমার মত বড়লোক বান্ধবীকে বসাতে পারি এমন যোগ্য আসনই বা আমার কোথায়?

শ্রীলেখা কৃত্রিম অভিমানে মুখখানি ভারী করে বললে, বন্ধুত্বের কাছে আবার গরীব বড়লোক কি? তুমি আমার বন্ধু। আমি তোমার বন্ধু। তুমি যেমন আমায় ভালবাস। আমিও তেমনি তোমায় ভালবাসি। সেইটাই তো আমাদের একমাত্র ও সত্যিকার পরিচয়। অন্তরের মিল যেখানে আছে, বাইরের খোলসটার সেখানে কতটুকুই বা দাম।

এমনি করে উভয়ের বন্ধুত্ব দিন দিন গাঢ় হতে থাকে। ক্লাসের অন্যান্য মেয়েরা ওদের দিকে চেয়ে আড়ালে চোখ টিপে হাসাহাসি করে।

কিন্তু ওদের যেন কোন কিছুতেই একটুকুও ভ্রুক্ষেপ নেই।

ওরা নিজেদের নিয়ে নিজেরাই বিভোল।

শশাঙ্কমোহন ভাইয়ের তার পেয়ে তাড়াতাড়ি শিলং থেকে ফিরে এসেছিলেন।

করালীর হত্যার ব্যাপারে সত্যই তিনি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যেন। একটা পাখী পুষলেও মানুষের তার উপরে মায়া পড়ে, তা এ তো মানুষ। এবং একদিন দুদিন নয় একাদিক্রমে ২১ বৎসর সে এ বাড়ীতে আছে।

শ্রীলেখা তো কেঁদেই খুন।

মৃগাঙ্ক শশাঙ্কমোহনকে বুঝিয়েছেন, করালী আত্মহত্যা করে মারা গেছে।

কিন্তু কেন? হঠাৎ সেই বা আত্মহত্যা করতে গেল কেন?

কিইবা এমন ব্যাপার ঘটতে পারে যার জন্য তাকে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিতে হলো।

আরো দু'চার দিন পরের কথা।

করালীর মৃত্যুর পর থেকে শশাঙ্ক চৌধুরী যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেছেন।

প্রায়ই দেখা যায় তিনি চুপচাপ একাকী বসে কি যেন ভাবেন।

সেদিনও বাইরের ঘরে চুপটি করে বসে আছেন, এমন সময় একজন উড়ে চাকর এসে দরজার উপরে দাঁড়াল—শরবতের গ্লাস নিয়ে।

শশাঙ্কমোহন যেন একুট বিস্মিত হয়েই নতুন চাকরটার মুখের দিকে তাকান।

কে তুই?

আজ্ঞে, মু রঘুনাথ অছি—

রঘুনাথ?

এমন সময় অশোক এসে ঘরে ঢোকে।

অশোকই বলে রঘুনাথকে দিন কয়েক হলো কাজে বহাল করা হয়েছে— করালীর মৃত্যুর পর শশাঙ্কমোহনের নিজের কাজকর্ম করে দেবার জন্য।

আট

ছায়া না কায়া

রাত্রি অনেক হয়েছে। কিন্তু এখনো শশাঙ্কমোহনের প্রাইভেট রুমে আলো জ্বলছে।

মৃগাঙ্কমোহন হঠাৎ কাল বিকালে একটা জরুরী তার পেয়ে কোথায় যেন গেছে। আজকাল প্রায়ই ঘনঘন সে দু'এক দিনের জন্য শ্রীপুর থেকে চলে যায়। আবার হঠাৎ একদিন ফিরে আসে।

এক জোড়া তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি নীচের বাগানে করবী গাছটাব আড়াল থেকে শশাঙ্কমোহনের দিকে চেয়ে চেয়ে কী যেন দেখছে।

হঠাৎ এমন সময় শশাঙ্কমোহনের ঘরের বাতি নিভে গেল। নিমেষে নিশ্ছিদ্র আঁধারে সমস্ত ঘরটা ভরে উঠলো।

চোখ দুটো তখনো কিন্তু করবী গাছটা আড়াল থেকে একইভাবে শশাঙ্ক-মোহনের ঘরের দিকে তাকিয়ে। বাইরে ক্ষীণ চাঁদের আলো যেন শ্রাবণ আকাশের মেঘস্তর ভেদ করে ঝাপসা ক্ষীণ মনে হয়।

সমস্ত জমিদার বাড়ী একেবারে নিস্তব্ধ নিঝুম আঁধারে ছায়ার মত স্তূপীকৃত হয়ে আছে।

চোখ দুটো দেখতে পায়, শশাঙ্কমোহনের ঘরের মধ্যে একটা অস্পষ্ট সাদা ছায়া এদিক ওদিক নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে।

অন্ধকারে করবী গাছটার আড়াল থেকে বিড়ালের মত নিঃশব্দে আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢাকা একটা ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এলো, তারপর সেই ছায়ামূর্তি কাছাড়ি বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

জমিদারবাবুর বসবার ঘরের ঠিক পাশ দিয়ে, যেখান থেকে উপরে উঠবার সিঁড়িটা—ছায়ামূর্তি সেই দিকে এগিয়ে চলল, তারপর নিঃশব্দে দুটো করে সিঁড়ি এক এক লাফে ডিঙ্গিয়ে উপরে উঠে গেল।

টানা বারান্দাটা রাতের নিঃসঙ্গ আঁধারে খাঁ খাঁ করে।

মাঝে মাঝে ঝোলান কার্নিশের ফাঁকে ফাঁকে ক্ষীণ অস্পষ্ট চাঁদের আলো বারান্দার উপরে এসে এখানে একটু ওখানে একটু করে ছড়িয়ে পড়েছে।

চোরের মত পা টিপে টিপে নিঃশব্দে ছায়ামূর্তি শিকারী বিড়ালের মত এগুতে লাগল রেলিং ঘেঁষে।

সহসা খুট করে একটা শব্দ শোনা যায়।

চকিতে ছায়ামূর্তি মস্তবড় একটা মাটির টবের পিছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

আগাগোড়া সাদা চাদরে ঢাকা একটা মূর্তি নিঃশব্দে শশাঙ্কমোহনের ঘর থেকে বাইরে এসে দরজাটা টেনে দিল।

মূর্তি এগিয়ে চলে।

এ বারান্দারই একটা দরজা দিয়ে অন্দর মহলে যাওয়া যায়।

মূর্তি এগিয়ে এসে সেই দরজা খুলে অন্দর মহলে প্রবেশ করল।

প্রথমেই মৃগাঙ্কমোহনের ঘর।

বাইরে থেকে সেই ঘরের দরজায় একটা তালা দেওয়া।

ছায়ামূর্তির হাতে একগোছা চাবি ছিল। সে একটার পর একটা চাবি দিয়ে ঘরের তালা খুলবার চেষ্টা করতে লাগল। গোটা পাঁচ ছয় চাবি চেষ্টা করার পর খুট করে একটা চাবি ঘুরে যেতেই তালাটা খুলে গেল।

মূর্তি তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকেই দরজা এঁটে দিল। চাবিটা কিন্তু তালার গায়েই আটকে রইল। মূর্তির হাতে একটা ছোট শক্তিশালী টর্চ ছিল। সেটা টিপে আলো জ্বালিয়ে ঘরটার চারিদিক একবার ভাল করে ঘুরিয়ে দেখে নিল।

মৃগাঙ্কর যাবতীয় জিনিষপত্র একটা দেওয়াল আলমারীতেই বন্ধ থাকত। মৃগাঙ্কর স্বভাবটা ছিল চিরদিনই ভারী অগোছাল। অথচ তার মনটা ছিল অত্যন্ত সৌখিন।

সমস্ত ঘরময় ইতস্তত সব জিনিসপত্র ছড়ান। এখানে জামা ওখানে কাপড়, সেখানে জুতো ইত্যাদি সব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

একপাশে একটা চামড়ার সুটকেশ হাঁ করে খোলা।

টেবিলের উপর গোটা পাঁচ সাত 'ক্যাপসটেন' সিগারেটের খালি টিন। অ্যাসট্রেটা ভর্তি একগাদা সিগারেটের ছাই জমা হয়ে আছে। ঘরের মেঝেয় একপর্দা ধুলো জমে রয়েছে। এদিক ওদিক সব পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি ছড়ান। একপাশে খাটে শয্যাটা ধূলো বালিতে ময়লা।

বিশৃঙ্খলতার যেন একখানি চূড়ান্ত প্রতিচ্ছবি।

ছায়ামূর্তি এগিয়ে গিয়ে আলমারীটার সামনে দাঁড়াল।

মূর্তির ডান হাতের মুঠোর মধ্যে একটা বাঁকানো মোটা লোহার তার। সেটা আলমারীর গা-তালার ফোকরে ঢুকিয়ে দিয়ে গোটা দুই জোরে মোচড় দিতেই আলমারীর কপাট দুটো ফাঁক হয়ে গেল।

আলমারীটা খুলে কি যেন সে খুঁজতে লাগল।

অল্পক্ষণ খুঁজতেই মূর্তি একটা কাগজের ছোট প্যাকেট দেখতে পেল একটা বিস্কুটের খালি টিনের মধ্যে।

তাড়াতাড়ি সেই প্যাকেটটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

পিছন ফিরে চাবিটা যেমন লাগাতে যাবে সহসা কোথা থেকে ঝুপ করে এসে একটা কালো চাদরের মত মাথার উপরে পড়ল। এবং চোখের পলকে একটা ফাঁসের মত কী যেন গলার উপর এঁটে গেল।

নয়

চঞ্চল সুনীল

সুনীল আর পানুর মধ্যে রমার স্নেহটা পানুকে ঘিরেই বেশী করে আবর্ত রচনা করে ফেরে। উদ্দাম ঝড়ো হাওয়ার মত সদাচঞ্চল সুনীল মাকে কাঁদায়।

রমার মনে সর্বদাই আশঙ্কা সুনীলের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। হাতের কাজ ফেলেই সুনীলকে বুকের মাঝে সস্নেহে টেনে নিয়ে তার রুক্ষ পশমের মতো এলোমেলো চুলগুলির উপর গভীর মমতায় হাত বুলাতে থাকে, সুনু বাবা আমার, দুদণ্ডও কী তুই সুস্থির হয়ে থাকতে পারিস না?

আমার জন্য তোমার বড্ড ভয় না মামণি? সুনীল তার ডাগর চোখ দুটি মায়ের ছলছল স্নেহ চঞ্চল দৃষ্টির সামনে তুলে ধরে বলে, কেন মা তুমি আমায় বাঁধতে চাও? এই চারিদিকে দেওয়াল ঘেরা ঘরের মধ্যে আমার মন হাঁপিয়ে ওঠে। পারি না আমি থাকতে মামণি, বাইরে কেমন উদার উন্মুক্ত প্রকৃতি। মাথার উপরে সীমাহীন নীল আকাশ। কেমন করে থাক মা তুমি এ ঘরে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, একটিবারও কী তোমার মন চায় না ঘর থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে যেতে? সুনীলের চোখ দুটো বাইরের আকাশে নিবদ্ধ।

কিসের ভাবে সে স্বপ্নাতুর।

সুনীল বলে চলে, আমাদের দেশের ছেলেগুলো চিরকালটা এমনি করেই মায়ের আঁচলের তলে ঘরের কোণে বদ্ধ রইলো, দেখলো না তার বাইরে বের হয়ে—জানলো না তারা বাইরে ঐ উদার উন্মুক্ত সীমাহীন প্রকৃতি কতবড় ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার নিয়ে আপনাকে আপনি দিকে দিকে বিলিয়ে দিয়েছে। শুনলে না তারা দিগন্ত প্লাবিত মুক্ত পাখীর গান। বাঁধন হারা সাগরের জলোচ্ছ্বাস। জান মামণি—ওদের দেশের ছেলেরা একটু ছুটি পেলেই দল বেঁধে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে, তাইতো তাদের দেশে জন্মায় কলম্বাস, লিভিংষ্টোন।

তারপর একটু থেমে আবার হয়ত বলে, আমি ছাড়াও তো তোমার আর একটি ছেলে আছে মা। তোমার পানু, সে তো ঘর থেকে বের হয়না। লক্ষ্মী ছেলেটির মত দিবারাত্র ঘরের মধ্যে বই নিয়ে বসে কাটায়। বাইরের ঐশ্বর্য ওর কাছে অন্ধকার।

পানু এসে ঘরে ঢোকে।

এই যে মা-মণি, তোমার সোনার যাদু এল। সুনীল পানুর দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলে।

আমার নামে বুঝি দাদা তোমার কাছে লাগাচ্ছে মামণি? পানু বলতে বলতে এগিয়ে আসে।

মা অন্য হাত বাড়িয়ে পানুকেও বুকের কাছটিতে টেনে নেয়, না রে না, দাদা যে তোকে কত ভালবাসে তাকি তুই জানিস নে পানু?

জানি মা, দাদা আমাকে সত্যি বড় ভালবাসে।

তাহলে তুমি কচু জান। সুনীল গম্ভীর হয়ে জবাব দেয়। তোমাকে কিসসু ভালবাসে না দাদা। দাদার বয়ে গেছে অমন ঘর-কুণো ভাইকে ভালবাসতে।

মা প্রসন্ন দৃষ্টিতে দুই ছেলের ঝগড়া দেখে আর মৃদু মৃদু হাসে। ওদের দাদু, রমার বাবা, বৃদ্ধ পরমেশ বাবু ঘরে এসে ঢুকলেন। কিসের দরবার চলেছে রমা।

তুমি বল দাদু, মার মনে কষ্ট দিয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করা ভাল, না মা যাতে করে সুখী হন, তাই করা ভাল।

আমার মতে কুণো হওয়াটাও ভাল নয়—মার কথা শোনা উচিত।

এ তোমার দাদু, মন রাখা কথা হলো, সুনীল বললে, পরমেশবাবু ও রমা চোখ চাওয়া চাওয়ি করে হাসতে থাকেন।

রাত্রি দশটা হবে।

সুনীল সেই দুপুরে তার বাইকে চেপে বের হয়েছে, এখনও ফেরেনি।

পড়ার ঘরে পানু একা টেবিল ল্যাম্পটি জ্বেলে পড়ার বই খুলে পড়ছে।

ঝড়ের মতই সুনীল এসে ঘরে ঢোকে। কি, দিন নেই রাত নেই, কেবল পড়া আর পড়া।

কে দাদা? এতরাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে? পানু জিজ্ঞাসা করে। পাতা বিছানাটার উপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে সুনীল বলে, চল পানু কাল রবিবার আছে, বেরিয়ে পড়ি—হাঁটতে হাঁটতে যতদূর পারি চলে যাই—তারপরই একটু থেমে বলে, উঃ যদি একটা আমার প্লেন থাকত।

পানু সহাস্যে বলে, তাহলে কি হতো দাদা?

তাহলে উড়ে যেতাম নীল আকাশের গায়ে ভাসমান মেঘের ফাঁকে ফাঁকে—উড়ে যেতাম দূরে দূরে বহুদূরে—মাটির পৃথিবী অস্পষ্ট ছায়ার মতই—যেন আঁচল পেতে ঘুমিয়ে আছে। কেমন মজা হতো বলত—how thrilling!

সুনীলের চঞ্চল আঁখি দুটি স্বপ্নময় হয়ে ওঠে যেন। সুনীল আপন মনে বলে চলে—

"ওগো সুদূর, বিপুল, সুদূর তুমি যে,
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।
মোর ডানা নাই আছি এ ঠাঁই
সে কথা যে যাই পাসরি।
আমি উৎসুখ হে,
হে সুদূর আমি প্রবাসী।
তুমি দুর্লভ দুরাশার মতো
কি কথা আমায় শুনাও সতত,
তব ভাষা শুনে তোমার হৃদয়
জেনেছে তাহার স্বভাষী
হে সুদূর আমি প্রবাসী।"

আমি মাঝে মাঝে কি স্বপ্ন দেখি জানিস পানু—আমি যেন উড়ে চলেছি প্লেনে —অনেক অনেক হাজার ফুট উঁচু দিয়ে—স্বপ্ন দেখি আমি যেন—গভীর রাতে ঘুমহারা তারার পাশে পাশে আমি আমার প্লেনে উড়ে চলেছি। নীচে ঘুমিয়ে আছে তুষারে আচ্ছন্ন হিমালয়। তুষারের টোপর এক পায়ে ভূতের মত রাত জাগে। পাইন গাছগুলি সবুজ পাতার টোপর মাথায় ঝিমুচ্ছে। কখনও হয়ত উড়ে চলেছি জ্যোৎস্নালোকিত আকাশ পথে, নীচে ধূ ধূ দিগন্ত বিস্তৃত সাহারার মরুভূমি। কখনও নীচে হয়ত গর্জে উঠেছে ফেনিল উত্তাল সাগরের ঢেউ।

পানু অবাক হয়ে সুনীলের কথা শোনে।

ওর দেহের প্রতি রক্তবিন্দুতে, বিন্দুতে যেন ঘর ছাড়া দিক হারার ডাক। হয়ত ও এমনি করেই একদিন সুদূরের পথে ভেসে যাবে। হয়ত ফিরবে, হয়ত বা ফিরবে না। কে জানে? ওর ভয় করে। রীতিমত ভয়ে ভয়ে ডাকে, দাদা?

সুনীলের কিন্তু খেয়াল নেই। বলে চলে, জানিস পানু, এতদিন কবে আমি হয়ত বেরিয়ে পড়তাম। কিন্তু পারিনা, মনে পড়ে মার মুখখানি, তাঁর ব্যথা করুণ চোখের দৃষ্টি, একদিকে দূর দুরান্তের হাতছানি, অন্যদিকে মায়ের নীরব কাকুতি।

অশান্ত চঞ্চল কল্পনা পিয়াসী সুনীল। সত্যিই দাদাকে পানুর ভারী ভাল লাগে।

দশ

ছিন্ন সূত্রের গ্রন্থি

ছায়ামূর্তির গলার ফাঁসটা আড়াআড়ি ভাবে পড়েছিল এবং ফাঁসটা লাগাবার সাথে সাথেই পিছনপানে এক হেঁচকা টান খেয়ে ছায়ামূর্তি আর টাল সামলাতে পারলে না। পিছন দিকে হেলে পড়ে গেল এবং পড়বার সময় মাথাটা একটা টবের গায়ে প্রচণ্ডভাবে ঠুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ও সমগ্র দেহটা যেন কেমন ঝিম ঝিম করে উঠল। সমস্ত স্মৃতি কেমন অসাড় ও গুলিয়ে একাকার হয়ে গেল। ছায়ামূর্তি ক্ষীণ অস্ফুট একটা শব্দ করে লুটিয়ে পড়ল।

শিথিল হাতের মুঠি থেকে একটা খাম মাটিতে পড়ে গেল। যে আততায়ী এতক্ষণ ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ করে তার উপর আচমকা পিছন থেকে চাদর চাপা দিয়ে ফাঁস লাগিয়েছিল সে এতক্ষণে এগিয়ে এল।

ক্ষিপ্রহস্তে ভূপতিত ছায়ামূর্তির মাথার উপর থেকে ফাঁসটা খুলে চাদরটা সরিয়ে নিল।

তারপর মাটির উপর থেকে খামটা তুলে নিয়ে নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে পড়ল।

ছায়ামূর্তির জ্ঞান যখন ফিরে এল তখনও মাথাটার মধ্যে কেমন যেন ঝিমঝিম করছে।

মাথাটা উঁচু করতে গিয়ে মনে হল যে সেটা যেন লোহার মতই ভারী। মাথার একটা জায়গা ব্যথায় টন টন করছে। হাত দিয়ে অনুভব করে বুঝল যে বেশ খানিকটা কেটে গেছে। অজ্ঞান হওয়ার আগের সমস্ত ঘটনাগুলি একে একে মনের পর্দার উপর ছায়াছবির মত ভেসে ওঠে।

হাতের উপর ভর দিয়ে লোকটা উঠে বসলো।

মেঘের আড়ালে বোধ হয় চাঁদ ঢাকা পড়েছে। চারিদিকে কালো আঁধার থমথম করে।

টর্চটা পাশেই পড়েছিল। একটু খুঁজতেই সেটা পাওয়া গেল।

টর্চের বোতাম টিপে আলো জ্বেলে আহত ব্যক্তি চারিদিক খুঁজল।

কিন্তু খামটি কোথাও দেখতে পেলে না।

আশ্চর্য! কোথায় গেল সেই খামটা।

তবে কি। —এতক্ষণে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা একটা ক্ষীণ সন্দেহের আকারে মনের কোণে উঁকি দিল।

কিন্তু কে সে?

ভোরবেলা খবরের কাগজটা পড়তে পড়তে কিরীটী রায় মাঝে মাঝে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে।

সুব্রত এসে ঘরে প্রবেশ করল।

শ্রীপুর রহস্যের কিছু কিনারা হলো? কালকের সে বস্তুটি কোন কাজে লাগল?

নিশ্চয়ই —লেগেছে বৈকি—দশ আনা হয়ে গেছে। বাকী ছয় আনা।

তার মানে, তবে তো প্রায় মেরে এনেছিস বল?

হ্যাঁ কতকটা। চার ফেলেছি—মাছ টোপ গিলবেই—কিন্তু ঐ যে গাছের ডালে দুটো চিল বসে আছে, তাদের নিয়েই মুশকিল বেঁধেছে।

চিল!

হ্যাঁ—

সামনেই টি'পয়ের ওপরে একটা সাদা কাগজের গায়ে কয়েকটা কথা বড় বড় অক্ষরে লেখা।

১ নম্বর—	বোতাম 'ম'
২ নম্বর—	চার বৎসর 'ম' 'শ'
৩ নম্বর—	চিঠি 'শ' 'ম'

সুব্রত টিপয়ের উপর থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে চোখ বুলিয়ে লেখাগুলির মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারলে না।

কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, এটা কি রে? কোন ধাঁধার উত্তর ঠিক করছিলি নাকি?

কিরীটী কাগজটার দিকে চোখ রেখেই জবাব দিল, না—একটা ধাঁধা তৈরি করবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু মিলাতে পারলাম না।

তাই নাকি?

এমন সময় জংলী সকাল বেলাকার ডাক এনে টিপয়ের উপর রাখে। কিরীটী চিঠিগুলি একটি একটি করে পড়ে নামিয়ে রাখতে লাগল।

হঠাৎ একটা চিঠি দেখে সেটা খাম ছিঁড়ে বের করে পড়তে পড়তে কিরীটীর চোখের মণি দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সে তাড়াতাড়ি চিঠিটা ভাঁজ করে জামার পকেটে রাখতে রাখতে বললে, সুব্রত, ঐ এক নম্বর অর্থাৎ বোতাম positive—অর্থাৎ হ্যাঁ—

সুব্রত খানিকক্ষণ হাঁ করে কিরীটীর প্রফুল্ল মুখখানির দিকে তাকিয়ে থেকে অবশেষে প্রশ্ন করলে, য়্যাঁ, কী বললি?

বললাম, পয়লা নম্বরে ভুল নেই। ওটার উত্তর মিলেছে।

এগারো

ঝোড়ো হাওয়া

একদিন সুনীল পানুকে বলে, দেখ পানু, কত লোক কত কি পায়, আমি দৈবাৎ যদি হাজার দেড়েক টাকা পেয়ে যেতাম কোন রকমে।

পানু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে, আজকাল কি তুমি দেশ ভ্রমণের কথা ভুলে গিয়ে টাকা পাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছো দাদা?

রামচন্দ্র। টাকার স্বপ্ন দেখবে সুনীল সেন? Never—অর্থাৎ কোন দিনও দেখেনি, দেখেও না। ভবিষ্যতেও দেখবে না। কিন্তু কি করব বল? দাদুকে এত করে জানালাম, but he is deaf—একেবারে কালা। অথচ টাকার অভাবে একটা মোটর বাইক আমার কেনা হচ্ছে না।

এতক্ষণে পানুর কাছে ব্যাপারটা সহজ হয়ে আসে—

দুটো দিন অপেক্ষা কর না দাদা, দাদুর টাকা তো সব আমাদেরই হবে।

আজকাল পানুও যেন একটু একটু করে সুনীলের দলে ভিড়তে শুরু করে দিয়েছে।

হবে? অর্থাৎ হতেও পারে না হতেও পারে? এদিকে সময় যে ফুরিয়ে যাচ্ছে। এ তুই দেখে নিস পানু, সুযোগ যদি একটা মিলে যায় তবে হেলায় হারাচ্ছি না। সত্যি আর এমনি করে জীবনটাকে অতি যত্নে মুঠোর মধ্যে নিয়ে ঘরের কোনে চুপটি করে শান্ত শিষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারছি না।

"দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান,
ডাকে যেন—ডাকে যেন সিন্ধু মোরে ডাকে যেন?"

রবি ঠাকুরের সেই কবিতাটা মনে নেই? ঐ যে,

"শিখর হইতে শিখরে ছুটিব
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব
হেসে খল খল গেয়ে কল কল
তালে তালে দিব তালি?
তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া,
নব নব দেশে বারতা লইয়া,
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান।"

দাদার কথার সুরে সুরে পানুরও সমস্ত হৃদয় অশান্ত হয়ে ছুটে যেতে চায়।

দুর্মদ চলার বেগ, যেন তার দেহের রক্ত বিন্দুতে বিন্দুতে গভীর উল্লাসের উদ্দামতায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

সুনীল যেন ঝড়ো হাওয়া।

হু হু শব্দে চারিদিক ওলট পালট করে বয়ে যায়। অফুরন্ত প্রাণ যেন তার সমগ্র দেহ বয়ে উপচে পড়ে।

কী উল্লাস, কী উদ্দামতা।

হঠাৎ সেদিন সুনীল কোন এক বন্ধুর মোটর বাইকটা চেয়ে নিয়ে এসে হাজির।

পানু খেয়ে দেয়ে কাপড় জামা পরে কলেজে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, দমকা হাওয়ার মতই সুনীল এসে ঘরে ঢুকল।

পানু, পানু।

দাদা?

বেড়াতে যাবি তো শীগগির আয়, দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি।

বেড়াতে, এখন? পানু আশ্চর্য হয়ে সুনীলের মুখের দিকে তাকায়।

হ্যাঁ বেড়াতে।

কোথায়?

কোথায়? তা তো জানিনা, যেদিকে দু'চোখ যায়। চলতো বেরিয়ে পড়া যাক।

পানুকে একপ্রকার টানতে টানতেই সুনীল মোটর বাইকে এনে তুলে গাড়ি স্টার্ট দিল।

হু হু শব্দে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে মোটর বাইক সুনীলের ছুটে চলেছে। দু'পাশের গাছ থেকে খসে পড়া শুকনো পাতাগুলি গাড়ির গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে ছুটে আবার পিছিয়ে পড়ে।

কোথায় আমরা চলেছি দাদা? পানু জিজ্ঞাসা করল।

গাড়ীর স্পিডোমিটারের সরু নিড়লটা ৪০।৫০ এর ঘরে ওঠা নামা করছে। সেই দিকে চেয়ে সুনীল বলে, আপাততঃ এই ট্র্যাঙ্ক রোড ধরে, যতক্ষণ না পেট্রোল ফুরায়। অফুরন্ত চলার বেগে আমি আজ ছুটবো।

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচেরে।
হৃদয় নাচেরে"

কালো কুচকুচে পীচ-ঢালা রাস্তা কখনো সোজা বরাবর কখনো এঁকেবেঁকে কোথায় কোন অজানায় আপনাকে হারিয়ে ফেলেছে। আপন মনে সুনীল ড্রাইভ করে চলেছে।

মাঝে মাঝে দু একটা মালবাহী গরুর গাড়ি কিম্বা লরী বা মোটর পাশ কাটিয়ে যায়। দু' একটা পথিক পথের মাঝে হয়ত দেখা যায়।

কোথাও পথের দু' পাশে অনুর্বর জমি, দু' একটা গরু ঘুরে বেড়ায়।

সুনীলের মোটর বাইক ছুটে চলে ঝড়ের বেগে যেন।

দুপুরের দিকে ওরা এসে এক জায়গায় গাড়ি থামাল। একটা ছোট খাবারের দোকান। সামনেই একটা টলটলে দীঘি। কয়েকজন মেয়ে পুরুষ স্নান করছে।

গাড়ি থেকে নেমে সুনীল ও পানু পুকুরের ঠাণ্ডা জলে বেশ করে আগে হাত মুখ ধুয়ে নিল।

দোকান থেকে কিছু দই, মিষ্টি ও চিঁড়ে নিয়ে দুজনে খেতে বসে গেল।

আঃ কি তৃপ্তি!

ফিরবার পথে আকাশে মেঘ দেখা দিল।

হাওয়া বইতে শুরু হলো। হয়ত ঝড় উঠবে। তা উঠুক।

দেখতে দেখতে প্রচণ্ড ঝড় জল শুরু হলো।

উঃ সেকি হাওয়া। মোটর বাইক ঠিকভাবে চালানোই কঠিন।

বৃষ্টির ছাঁট সর্বাঙ্গ সপ সপ করে ভিজিয়ে দিল।

মাঝে মাঝে মেঘের গর্জন,কড়-কড়-কড়াৎ—কানে তালা লাগার জোগাড়।

পথের দুপাশের গাছগুলো হাওয়ায় মড় মড় করে ওঠে। ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসে।

সুনীল গাড়ির হেড্‌লাইট জ্বালিয়ে দিল।

পানু বললে, গাড়ি থামিয়ে একটু কোথাও দাঁড়ালে হতো না দাদা?

সুনীল হাসতে হাসতে বলে, ভয় করছে বুঝি?

চোখের মণি দুটো জ্বল জ্বল করে জ্বলে।

পানু বললে, ভয় আমার কোন দিনও নেই দাদা।

সুনীল বললে, That's like a good boy.

ওগো আজ তোরা যাসনে গো তোরা
যাসনে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার বেলা বেশী আর নাহিরে।
ঝর ঝর ধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ওই বেনুবন দুলে ঘনঘন
পথ পাশে দেখ চাহিরে
ওগো অন্ধ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।"

বারো

পুরানো দিনের ইতিহাস

ষোল বছর আগেকার এক রাত্রি।

গভীর রাত্রি।

জমিদার শশাঙ্কমোহন তাঁর শোবার ঘরে অস্থির অশান্তপদে ইতস্ততঃ পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন।

শশাঙ্কমোহনের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে, তিনি যেন আজ বড়ই চিন্তিত।

ছোট ভাই মৃগাঙ্ক এসে ঘরে প্রবেশ করল, দাদা?

মৃগাঙ্কের ডাকে শশাঙ্কমোহন মুখ তুলে ভাইয়ের দিকে তাকালেন।

বাড়ির ভিতরের খবর কি মৃগু?

এখনও কিছু হয়নি। তুমি এবারে শুয়ে পড়গে। দাইকে তো বলাই আছে যে ছেলে হওয়া মাত্রই শাঁখ বাজাবে।

কিন্তু আমার যে ঘুম আসছে না ভাই।

চিন্তা করে লাভই বা কি বল? রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে। আর আমি তো এদিকে আছিই। তুমি শুয়ে পড়গে। কথাগুলো বলে মৃগাঙ্ক ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

শশাঙ্কমোহন শ্রীপুরের জমিদার। তার জমিদারীর আয় বছরে প্রায় লাখ টাকা।

যদিও শশাঙ্কমোহনের খুল্লতাত ভাই ঐ মৃগাঙ্কমোহন—তবু সেটা বুঝবার উপায় নেই। ঠিক যেন সহোদর ভাই ওরা।

অত্যন্ত স্নেহ করেন শশাঙ্কমোহন মৃগাঙ্গমোহনকে। মৃগাঙ্কমোহনও দাদা বলতে অজ্ঞান।

বিবাহের পর আট বছর চলে গেল—

সবাই ভেবেছিল বিভাবতীর বুঝি কোন ছেলেপুলে হবেই না—

অনেকেই শশাঙ্কমোহনকে আবার বিবাহ করতে পরামর্শ দিয়েছিল কিন্তু শশাঙ্ক কারো কথাতেই কান দেন নি।

তিনি হাসতে হাসতে বলেছেন, ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হবে। সন্তান লাভ যদি আমার ভাগ্যে না থাকে তবে একটা কেন দশটা বিবাহ করলেও আমার ছেলে হবে না।

তারপর দীর্ঘ আট বছর। বাপ অনঙ্গমোহনের মৃত্যুর দুই বছর পরে হঠাৎ একদিন শোনা গেল বিভাবতীর নাকি ছেলেপুলে হবে।

সমস্ত জমিদার বাটীতে আনন্দের স্রোত বইতে লাগল। দিবারাত্র অতিথি, কাঙ্গালী, আতুরের কলধ্বনিতে জমিদার বাটী গম্‌গম্‌ করতে লাগল।

দেবালয়ে শঙ্খ-কাঁসর-ঘণ্টা বাজতে লাগল। পুজো—স্বস্ত্যয়ন—হোম—যাগ—যজ্ঞ।

তারপর একদিন এল সেই বহু আকাঙ্খিত দিনটি।

সেদিন আবার বাইরে কি দুর্যোগ।

কি ঝড়—কি বৃষ্টি।

বিভাবতী আঁতুড় ঘরে।

এখনো কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি।

মৃগাঙ্ক স্বয়ং দাঁড়িয়ে সমস্ত খবরদারী করছে।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। বৃষ্টিটা তখন একটু কমেছে বটে তবে আকাশ মেঘে মেঘে একেবারে কালো হয়ে আছে। থেকে থেকে সোনালী বিদ্যুতের ইশারা এবং সোঁ সোঁ প্রবল হাওয়া। সহসা ঐ সময় শোনা গেল শঙ্খধ্বনি।

শশাঙ্কমোহনও ছুটলেন। অন্দর মহলের শেষ প্রান্তে আঁতুড় ঘর। আঁতুড় ঘরের দরজার গোড়াতেই বলতে গেলে প্রায় শশাঙ্কমোহনের মৃগাঙ্গর সঙ্গে দেখা হল।

কি হয়েছে মৃগু—ছেলে না মেয়ে?—

মৃগাঙ্কর মুখখানা হাসি হাসি। সে বলে, ভেবেছিলাম ছেলেই হবে বৌদির কিন্তু—

কিন্তু কি—

মেয়ে হয়েছে—

থমকে যেন দাঁড়িয়ে পড়লেন শশাঙ্কমোহন। বিষণ্ণ স্বরে বল্লেন, মেয়ে?

হ্যাঁ—তাতে কি হয়েছে?

মেয়েই হলো—

ভগবান করুন এখন ঐ বেঁচে থাক—

শশাঙ্কমোহন আঁতুড় ঘরের দিকে এগোচ্ছিলেন, কিন্তু মৃগাঙ্কমোহন বাধা দেয় না—দাদা ওদিকে এখন যেওনা। লেডি ডাক্তার যেতে নিষেধ করেছে ওদিকে এখন কাউকে—কারণ বৌদি এখনো অজ্ঞান হয়ে আছেন।

একটিবার দেখেই যদি চলে আসি মৃগু—

না-এখন যেও না—

কি আর করবেন শশাঙ্কমোহন।

লেডি ডাক্তার ওদিকে এখন কাউকে যেতে যখন নিষেধই করেছে!

শশাঙ্কমোহন চিন্তিত মনে আপন শয়ন কক্ষের দিকে ফিরে গেলেন।

তারপর রাত্রি আরো গভীর হয়েছে।

একে দুর্যোগের রাত্রি, তাই আবার টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়েছে। মাঝে মাঝে হু হু করে জোলো হাওয়া গাছের পাতায় পাতায় শাখার শাখায় দোলা দিয়ে যেন শিপ্ শিপ্ করে ভুতুড়ে কান্না কাঁদছে।

কেউ কোথাও জেগে নেই।—

লেডি ডাক্তার চলে গেছে। বিভাবতী অঘোরে ঘুমিয়ে। ওষুধ দিয়ে তাঁকে ঘুম পাড়ান হয়েছে।

টুক্ টুক্ করে মৃগাঙ্কমোহনের ঘরের দরজায় টোকা পড়ল।

মৃগাঙ্কমোহন জেগেই ছিল, ঘর অন্ধকার—দরজা খুলে দিতেই একটি নারী মূর্তি ঘরে এসে ঢুকল।

কে! মৃগাঙ্ক চাপা গলায় শুধায়।

আমি—

শেষ করে দিয়েছ তো—

না—

সেকি?

হ্যাঁ—প্রয়োজন হয়নি, সত্যি সত্যি মেয়েই হয়েছে—

ঠিক আছে যাও—

নারী মূর্তি চলে গেল যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে।

আরো কিছুক্ষণ পরে আঁতুড় ঘরে।

বিভাবতী ঘুমের ঔষধের প্রভাবে তখনো অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘরের মধ্যে একটি মাত্র মাটির প্রদীপ জ্বলছে—সেই প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় ঘরের মধ্যে একটা আলোছায়া যেন লুকোচুরি খেলছে।

বাইরে দুর্যোগ তখনো থামেনি—প্রবল হাওয়ার সঙ্গে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে।

টুক্—টুক্—টুক্।

বদ্ধ দরজার গায়ে মৃদু সতর্ক টোকা পড়ল। ঠিক তিনবার।

দাই মঙ্গলা পা টিপে টিপে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। অন্ধকার ছায়ার মত যেন কে একজন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

মঙ্গলা—এসেছি—ছায়ামূর্তি চাপা কণ্ঠে যেন ফিস ফিস করে বলে।

দাঁড়াও আমি আসছি—

মঙ্গলা আবার আঁতুড় ঘরে ঢুকে গেল এবং একটু পরে একটি নবজাত শিশুকে বুকে জড়িয়ে বের হয়ে এল—

তারপর ফিস ফিস করে চাপা কণ্ঠে দুজনার মধ্যে কি কয়েকটা কথা হলো।

আগন্তুক যেমন এসেছিল তেমনি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল নবজাত শিশুটিকে বুকের মধ্যে নিয়ে।

মঙ্গলা আঁতুড় ঘরে ঢুকে আবার দরজায় খিল তুলে দিল। এবার সে যেন নিশ্চিন্ত।

বিভাবতীর একটি কন্যা হয়েছে সকলে জানল।

নবজাত শিশুর কল্যাণে দান ধ্যান—যাগ যজ্ঞ কত কি হলো। কত মিষ্টান্ন জনে জনে বিতরণ করা হলো।

সব ব্যাপারে বেশী উৎসাহী যেন মৃগাঙ্কমোহনই।

দিন যায়—মাস যায়—বছর ঘুরে আসে।

মৃগাঙ্কমোহনই শিশুর নামকরণ করল—শ্রীলেখা।

ক্রমে মেয়ে আরো বড় হয়—লেখা পড়া শুরু করে—

মৃগাঙ্কমোহনের বড় আদরের ভ্রাতুষ্পুত্রী।

চৌধুরী বংশের দুলালী —আদরিণী—শ্রীলেখা।

তের

হারিয়ে যাওয়া ছেলে

হরিঘোষ স্ট্রীটের একটা মেস বাড়ি।

সকাল সাতটা সাড়ে সাতটা হবে, মধ্যবয়সী একজন লোক সেদিনকার দৈনিকটা খুলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কী যেন পড়ছে। বিজ্ঞাপনের নিরুদ্দেশের পৃষ্ঠায় একটা বিজ্ঞাপন বের হয়েছে।

'হারিয়ে যাওয়া ছেলে। হারিয়ে যাওয়া ছেলে।'

ছেলেটি চুরি হয়ে গিয়েছিল, যেদিন সে জন্মায় সেইদিনই। তারপর ঘটনাচক্রে সে মানুষ হয় এক অনাথ আশ্রমে। এগার বছর যখন তার বয়স তখন সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় আবার সেই অনাথ আশ্রম থেকে। আশ্রমের নাম 'হরমোহিনী আশ্রম'। ছেলেটি দেখতে কালো—দোহারা চেহারা—প্রকৃতি চঞ্চল—তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরে এবং ছেলেটির ডান ভ্রুর নীচে একটা জরুল আছে। যদি কেউ নিম্নলিখিত ঠিকানায় ছেলেটির সংবাদ দিতে পারে তবে সে বিশেষ পুরস্কার পাবে।

এস রায়
নং আমহার্স্ট স্ট্রীট,
কলিকাতা'

রোগা লিকলিকে একজন লোক এসে ঘরে প্রবেশ করল।

লোকটার গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। একমাথা রুক্ষ চুল। ময়লা ধুতি পরিধানে, গায়ে একটা ময়লা তালি দেওয়া ডোরাকাটা সিল্কের সার্ট।

কিশোরী—রোগা লোকটি ডাকে।

উঁ।

বলি কি ব্যাপার?

উঁ।

বলছি হঠাৎ খবরের কাগজ এমন কি গোপন হীরার সন্ধান পেলি?

এতক্ষণে কিশোরী আগন্তুকের দিকে সংবাদপত্র থেকে মুখ তুলে তাকায়।

কে? জগন্নাথ, আয়। আজকের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বের হয়েছে দেখ—

কিসের বিজ্ঞাপন?

একটী ছেলের?

ছেলের?

হ্যাঁ, হারানো ছেলের সন্ধান দিতে পারলে পুরস্কার।

কত দেবে?

তা-কিছু লেখেনি। তবে—

কি তবে—

ব্যাপারটা শাঁসালো মনে হচ্ছে।

কিসে বুঝলি?

বুঝেছি।

দেখি বিজ্ঞাপনটা।

কিশোরী দৈনিকটা এগিয়ে দিল জগন্নাথের দিকে।

কই? কোথায়?—

এই যে। কিশোরী আঙ্গুল দিয়ে ছেলে হারানোর বিজ্ঞাপনটা দেখায় জগন্নাথকে।

জগন্নাথ বিজ্ঞাপনটার উপরে ঝুঁকে পড়ল।...

একটা বিড়ি ধরিয়ে কিশোরী ঘন ঘন টান দিতে লাগল পাশে বসে।

জগন্নাথ বিজ্ঞাপনটা আগাগোড়া পড়ে চোখ তুলল।

পড়লি?

হুঁ—আমার মনে হচ্ছে তোর অনুমানটা হয়ত মিথ্যে নয় কিশোরী—তাহলে?

বল কি করতে হবে?

শোন, আজই হরমোহিনী আশ্রমে গিয়ে একটা খোঁজ খবর নিতে হবে। আর এদিকে বাকী—কথাটা কিশোরী জগন্নাথের কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বললে।

আনন্দে জগন্নাথের চোখের মণি দুটো অস্বাভাবিক এক উজ্জ্বলতায় ঝক্ ঝক্ করে উঠল।

কিন্তু ভায়া একটা কথা আছে। জগন্নাথ বললে।

কী?

বুঝতে পারছো না?

না। কি বলতে চাস খুলে বল।

মানে, ঐ বিজ্ঞাপন হচ্ছে ফেউ, ওর পিছনে বাঘ আছে।

বাঘ।

হুঁ। বুঝতে পারছো না এখনো। ঠিকানাটা কোথাকার?

আমহার্স্ট স্ট্রীট থেকে দেওয়া হয়েছে না?

তা হয়েছে—

নম্বরটা মনে হচ্ছে সুব্রত রায়ের বাড়ি।

বলিস কি?

তাই—অতএব ঐ বিজ্ঞাপনের পশ্চাতে নির্ঘাৎ তিনি আছেন।

কে?

কে আবার। শ্রীল শ্রীকিরীটী রায়—

কোন কিরীটী?

রহস্যভেদী কিরীটী রায়। আবার কোন কিরীটী রায়—

তা হোক। যা জানাবার আছে তা আজই দুপুরে ঐ লোকটার কাছ থেকে সব জেনে আসবি।

দিন পাঁচেক পরে দুপুরের দিকে বাইরের রোদটা বেশ চড়চড়ে হয়ে উঠেছে।

অসহ্য গরমে বাইরের তপ্ত হাওয়া গায়ে জ্বালা ধরায়। দরজা জানালা আটকে সুব্রত দ্বিপ্রহরে একটা সুখনিদ্রা দেবার চেষ্টা করছে, এমন সময় ভৃত্য এসে জানাল কে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওর সঙ্গে একটা জরুরী কাজের জন্য একটিবার দেখা করতে চান।

ভদ্রলোককে বাইরের ঘরে বসা, আমি যাচ্ছি। সুব্রত বলে।

ভৃত্য চলে গেল।

সুব্রত বাইরের ঘরে এসে দেখে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক চুপচাপ একটা সোফা অধিকার করে দরজার দিকে উদগ্রীব হয়ে চেয়ে আছেন।

নমস্কার।

নমস্কার, সুব্রত একটা সোফা অধিকার করে বসল।

ভদ্রলোক জামার বুক পকেট থেকে সেদিনকার খবরের কাগজের কাটিংটা বের করলেন, এই বিজ্ঞাপনটা আপনিই দিয়েছেন? মানে আপনার নামই তো এস, রায়?

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি?

মানে, আমি বোধহয় আপনাদের সেই হারানো ছেলেটির খোঁজ দিতে পারব।—

আপনার নাম? কোথা থেকে আসছেন?

শ্রীরঘুনাথ ঘোষাল। অবিশ্যি এখানেই এই শহরেই থাকি—মানে চেতলায়।

যে ছেলেটির কথা বলছেন সে ছেলেটি কোথায় আছে?

আমার কাছেই আছে।

আপনার কাছে।

হ্যাঁ—

তা এই যে সেই ছেলে তা আপনি বুঝলেন কি করে?

সে বলতে পারব না—তবে এই ছেলেটির ডান ভ্রুর নীচে একটা জরুল আছে আর—

আর?

আর ছেলেটি আমার কেউ নয়—বছর চারেক ধরে প্রতিপালন করছি মাত্র—

প্রতিপালন করছেন!

তাই—রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে দেখে আমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে আমার বাড়িতে স্থান দিই। সেই থেকে আমার কাছেই আছে। এবং ছেলেটিকে দেখলে সহজেই বোঝা যায় সাধারণ ঘরের ছেলে সে নয়—কোন ধনীর সন্তানই হবে। সুন্দর চেহারা—

ছেলেটিকে যখন আপনি পান তখন তার বয়স কত হবে?

তা ধরুন দশ—এগার তো হবেই—

নাম কি বলেছিল!

সুধীর—

এখুনি আপনার ওখানে গেলে ছেলেটিকে কি একবার দেখা যেতে পারে!

কেন যাবে না—তবে একটা কথা আছে।

কি বলুন!

আপাততঃ সে কলকাতায় নেই—

কোথায় আছে?

ছেলেটি এখন মীরাটে আমার স্ত্রীর কাছে আছে।

কবে'তক এনে দেখাতে পারবেন ছেলেটিকে—

তা মনে করুন দিন দশেক তো লাগবেই।

বেশ—তবে সেই ব্যবস্থাই করুন।

আচ্ছা।

একটা কথা।

বলুন।

ছেলেটির কোন ফটো আপনাদের কাছে আছে?

সুব্রত ঘাড় নেড়ে বলে, না—

তবে ! তবে ছেলেকে সনাক্ত করবেন কি করে?

সে ব্যবস্থা হবে—

কি করে?

হরমোহিনী আশ্রমে গেলেই সেখানকার হেড মাস্টার চিনতে পারবেন—

বেশ—তবে সেই কথাই রইলো। আমি তাহলে এখন উঠি।

আসুন।

ভদ্রলোককে বিদায় দিয়ে সুব্রত আর এক মুহূর্ত দেরি করে না। সঙ্গে সঙ্গে জামা কাপড় পরে টালীগঞ্জে কিরীটীর বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে।

চৌদ্দ

ঘরের ছেলে

কিরীটী বাসাতেই ছিল।

সুব্রত হাসতে হাসতে কিরীটীকে বললে, তোর ও খবরের কাগজের প্যাঁচ বোধহয় শেষ পর্যন্ত লেগে গেল রে।

কিরীটী একটা পেনসিল দিয়ে কাগজের গায়ে হিজিবিজি কাটছিল, মুখ না তুলেই জবাব দিল, হিসাবের কড়ি বাঘে খায়না রে, বুঝলি? চৌদ্দ আনা মীমাংসা তো প্রায় হয়েই আছে। বাকী দু'আনার জন্য গোলমাল বেঁধেছিল। দেখ তাও বোধ হয় হয়ে এল।

বলত ব্যাপার কী?

Advertisement টা কতদিন হলো দেওয়া হচ্ছে?

তা প্রায় দিন পনের তো হবেই—

এমন সময় জংলী এসে ঘরে প্রবেশ করল। কিরীটী ওর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, কি চাস—

চা দেব কী?

নিশ্চয়ই, যা—নিয়ে আয় জলদি।

সুব্রত তখন এক নিঃশ্বাসে একটু আগের দুপুরের সকল ঘটনা সবিস্তারে বলে গেল।

কিরীটী শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে উঠল।

কি জানি কেন—কিরীটী কিন্তু খুব উৎসাহিত বোধ করে না।

সুব্রত জিজ্ঞাসা করে, কি ভাবছিস?

কিছু না—

তোর কি মনে হয়—ঐ ছেলেই কি—

দেখা যাক—

রঘুনাথ লোকটি আর কেউ নয়—পূর্ববর্ণিত কিশোরী।

কিশোরী আর জগন্নাথ শহরের ভদ্রবেশ ধারী দুটি নাম করা গুণ্ডা। তাদের অসাধ্য কোন কাজ নেই। বিজ্ঞাপনটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিশোরীর মনে একটা মতলব খেলে যায়।

পরামর্শ করে তারপর সে জগন্নাথকে সুব্রতর কাছে পাঠায়।

সেখানে যখন জানতে পারে ছেলেটিকে ওরাও চেনেনা এবং চেনে কেবল একমাত্র 'হরমোহিনী' অনাথ আশ্রমের সিংহী লোকটা—ওরা গিয়ে গোপনে সিংহীর সঙ্গে দেখা করে, এবং টাকার লোভ দেখিয়েও প্রাণের ভয় দেখিয়ে সিংহীকে দলে টানে।

তারপর—

সাত দিন পরে সুব্রতর গৃহে ছেলেটিকে নিয়েই রঘুনাথ ওরফে জগন্নাথ এসে হাজির হলো।

সুব্রত আর কিরীটী ছেলেটিকে নিয়ে তখন টালীগঞ্জে হরমোহিনী আশ্রমে গেল—সেখানকার সুপারিনটেণ্ডেন্ট সনাক্ত করল ঐ ছেলেটিকেই সুধীর চৌধুরী বলে।

অতঃপর কিরীটী ছেলেটিকে নিয়ে শশাঙ্ক চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করাই ঠিক করলে এবং পরের দিন ছেলেটি ও জগন্নাথ সহ শ্রীপুরের দিকে রওনা হলো।

শশাঙ্কমোহন বাইরের ঘরে চুপটি করে বসে সেদিনকার খবরের কাগজটা উল্টে পাল্টে দেখছেন, এমন সময় সেদিনকার সেই ভদ্রলোকটি এসে ঘরে প্রবেশ করল।

নমস্কার শশাঙ্কবাবু।

শশাঙ্কমোহন মুখ তুলে চাইলেন।

কিন্তু ভদ্রলোকের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে একটি সুশ্রী বছর পনেরর ছেলে। একটু পরে কিরীটী ইঙ্গিতে জগন্নাথকে ছেলেটিকে নিয়ে পাশের ঘরে যেতে বলল।

ধূর্জটিবাবু—কি খবর।

একটা বিশেষ জরুরী কাজে এসেছি—

বলুন।

আপনার হারিয়ে যাওয়া ছেলের সন্ধান বোধ হয় পাওয়া গিয়েছে—

সত্যি—আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন শশাঙ্কমোহন, কোথায়—কোথায় পেলেন—

ব্যস্ত হবেন না—শুনুন একটু।

কিন্তু—?

যে ছেলেটিকে দেখলেন—বলে সংক্ষেপে জগন্নাথ কাহিনী বর্ণনা করে কিরীটী, ঐ—বোধ হয় আপনার ছেলে—।

অতঃপর ছেলেটিকে আবার ঘরে ডেকে আনা হলো।

শশাঙ্কমোহন একদৃষ্টে চেয়ে আছেন তখনো ঐ ছেলেটির দিকে। সরল গোবেচারী গোছের চেহারা ছেলেটির।

এবং তারপর আবার ছেলেটিকে কিরীটী পাশের ঘরে যেতে বলল। ছেলেটি চলে গেল।

কিরীটী বলে, আপনার সেই ফটোটা থাকলে হয়ত নিশ্চিন্ত ও আমরা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারতাম—তবে 'হরমোহিনী' আশ্রমের সুপারিনটেনডেণ্ট—স্থির নিশ্চিত—বললেন এই সেই নিরুদ্দিষ্ট সুধীর—

বলেছেন—বলেছেন—তিনি!

হ্যাঁ—তবে একটা কথা আছে—

বলুন।

ব্যাপারটা আরো কিছু দিন বোধহয় গোপন রাখাই ভাল হবে—

বেশ—কিন্তু ছেলেটি—

ইচ্ছা করলে তাকে এখানে আপনি রাখতে পারেন তবে —ছেলেটি বা কেউ যেন না জানে—আসলে সে কে। কি তার পরিচয়।

বেশ—তাই হবে।

কিরীটী ছেলেটিকে রেখে ফিরে গেল শশাঙ্কমোহনেরই অনুরোধে। কিন্তু শশাঙ্কমোহন কথা রাখতে পারলেন না।

এতদিন পরে হারানো ছেলের সন্ধান পেয়ে আনন্দে দিশেহারা হয়ে স্ত্রী বিভাবতীকে ডেকে সব খুলে বললেন।

বিভাবতী যখন এতকাল পরে স্বামীর মুখে শুনলেন—আসলে তাঁর মেয়ে হয়নি—হয়েছে ছেলে এবং সেই ছেলে এতকাল পরে তাঁর বুকে ফিরে এসেছে—আনন্দে যেন পাগল হয়ে যান!

কি করবেন ভেবে পান না। এবং স্বামীর অনুরোধ সত্ত্বেও কথাটা গোপন রাখতে পারেন না। একটু একটু করে কথাটা জানাজানি হয়ে যায়। সংবাদটা মৃগাঙ্গমোহনও শুনলেন।

মৃগাঙ্কমোহন এসে জিজ্ঞাসা করলেন, এসব কি শুনছি দাদা? সত্যি তবে কি আপনার ছেলেই হয়েছিল?

হ্যাঁ। শশাঙ্কমোহন গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন।

তবে এতদিন সেকথা লুকানো ছিল কেন?

প্রয়োজন ছিল।

প্রয়োজন তখন ছিল, না এখন হয়েছে? মৃগাঙ্কমোহনের গলার স্বর কঠিন ও রূঢ়।

শশাঙ্কমোহন চুপ করে রইলেন।

আর এ ছেলে যে সত্য সত্যই জমিদার শশাঙ্ক চৌধুরীর তারই বা প্রমাণ কি? উইলের দাবীকে দাঁড় করাবার জন্য এটা স্বয়ং জমিদারের একটা যে চাল নয় তাই বা কে বলবে?

তুমি কি বলতে চাও মৃগু?

আমি যা বলতে চাই তা অত্যন্ত সহজ ও সরল।

অর্থাৎ—

অর্থাৎ এ ছেলে আপনার নয়। কস্মিনকালে ও কোন দিন আপনার ছেলে হয়নি। আপনার মেয়েই হয়েছিল, সেকথা গায়ের জোরে আপনি স্বীকার করতে চাইলেও আদালত অস্বীকার করবে না—

আর যদি প্রমাণ করতে পারি যে এ ছেলে আমার?

দিনকে রাত করতে চাইলেই তা কিছু সম্ভব হয় না। অতএব পাগলামি বা একটা কেলেঙ্কারী না করাই কি ভাল নয়। কথাগুলো বলে মৃগাঙ্কমোহন ঘর ছেড়ে চলে গেল।

পনের

অনাথ আশ্রম

আজ থেকে চার বছর আগেকার কথা।

টালীগঞ্জ গঙ্গার ধারে 'হরমোহিনী অনাথ আশ্রম'। মা বাপ হারা আতুরের দল, যাদের এ দুনিয়ায় কেউ নেই তাদের জন্য এই আশ্রম।

চারপাশে দু'মানুষ উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড। কম্পাউণ্ডের একদিকে হলঘর, অন্যদিকে ছাত্রাবাস ও মাস্টারদের থাকবার ঘর।

অনাথ আশ্রমের সুপারিনটেণ্ডেন্ট মিঃ কে, সিংহ। দেখতে তিনি যেমন কালো, মোটা তেমনি হাতীর মত। আসল নাম কুলদা সিংহ। হাতীর মত না হলেও কান দুটো মিঃ সিংহের একটু বড়ই ছিল। দিদিমা আদর করে নাম দিয়েছিল, 'কুলদা'।

শোনা যায় ছেলে বেলায় খেলার সাথীরা কুলদা নামের একটা চমৎকার ভাবার্থ বের করে একটি কবিতাও বানিয়েছিল।

কুলোর মত দুটো যার কান,
কুলদা তাহার নাম।

মিঃ সিংহ ছিলেন যেমন বদরাগী তেমনি সন্দেহ বাতিকগ্রস্থ। কাউকেই তিনি ভাল চোখে দেখতে পারতেন না। সামান্য একটু দোষ ত্রুটি হলে আর রক্ষা ছিল না।

শাস্তির বহরটিও ছিল তাঁর বিচিত্র।

আশ্রমের এক কোণে অন্ধকার ঘর বলে এক কুঠুরী ছিল। সেই কুঠুরীর একটি মাত্র দরজা, আর ছোট ছোট দুটি জানালা। তাও একমানুষ সমান উঁচুতে।

আশ্রমের ছেলেদের মধ্যে যদি কেউ কোন দোষ করত তবে তাকে দশ ঘা বেত মেরে সেই দিন রাতে না খেতে দিয়ে সেই অন্ধকার ঘরে' বন্ধ করে রাখা হতো।

অন্ধকার ঘর ছেলেদের কাছে ছিল একটা পরিপূর্ণ আতঙ্ক।

মিঃ সিংহ ছাড়া সেখানে থাকতেন আরো তিনজন মাস্টার, দু'জন চাকর. একজন দারোয়ান ও একজন ঠাকুর।

ছাত্রদের সংখ্যা মোটমাট ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ।

তার মধ্যে পাঁচ ছয় থেকে পনের ষোল বছরের পর্যন্ত ছেলে ছিল। এ

আশ্রমের নিয়ম ছিল, ম্যাট্রিক পর্যন্ত পাশ করিয়ে দিয়ে ছেলেদের একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া হতো।

সুধীর এই আশ্রমেরই একজন ছেলে।

সুধীর এখন তো বেশ বড় হয়ে গিয়েছে।

এগার বছর বয়স তার। কিন্তু এখানে এসেছিল খুব ছোট যখন সে—মাত্র ছয় বছরের বালক।

মা তাকে এখানে রেখে গিয়েছিল একদিন ঘুমের মধ্যে । ঘুম ভেঙ্গে দেখে এই আশ্রমে ও রয়েছে।

ঘুম ভাঙ্গার পর কেঁদেছে—তারপর আরো কত কেঁদেছে।

কিন্তু মা আর আসেনি। মাকে আর ও দেখতে পায় নি।

সুধীরের গড়নটা ছিপছিপে। গায়ের রঙ কালো, বাঁশীর মত টিকোল নাক। স্বপ্নময় দুটি চোখ। দোহারা চেহারা।

তাহলে কি হবে? সুধীরের মত দুরন্ত ছেলে সমস্ত আশ্রমের মধ্যে আর নেই।

দৌড়, ঝাঁপ, সাঁতার, দুষ্টুমিতে সব বিষয়েই ও সকলকে ডিঙ্গিয়ে চলে, এমন কি, লেখাপড়াতেও কেউ ওর সঙ্গে পেরে ওঠে না।

অন্যান্য ছেলেরা ওকে ভয়ও যেমন করে, ভালবাসেও ঠিক তেমনি।

সুধীরের সব চাইতে গোঁড়া ভক্ত 'ভিখু'।

ভিখু সুধীরের চাইতে বছর খানেকের হয়ত ছোট হবে।

ভিখু কিন্তু সুধীরের ঠিক বিপরীত।

চেহারার দিক দিয়ে গাঁট্টা গোট্টা বলিষ্ঠ চেহারা। খুব ফর্সা গায়ের রং। কুতকুতে চোখ দুটি মেলে ফিক্ ফিক্ করে হাসে। এক পাটি মুক্তার মত দাঁত ঝক্ ঝক্ করে।

ছায়ার মতই ভিখু সুধীরের পিছন পিছন ঘোরে।

ভিখুর যখন বছর চারেক বয়েস, তখন ওকে কুম্ভ মেলায় এই আশ্রমের এক মাস্টার কুড়িয়ে পান।

ওর পরিচয় জিজ্ঞসা করা হলেও ও শুধু কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, ওর নাম ভিখু। ও আর কিছুই বলতে পারেনি।

মাস্টার এখানে এনে ওকে ভর্তি করে দিল।

সেই থেকে ও এইখানেই আছে।

গ্রীষ্মের বেলা দ্বিপ্রহর।

চারিদিকে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে।

সিংহীর কড়া হুকুম, যে যার ঘরে বসে পড়াশুনা করবে।

আশ্রমের দু'জন চাকরের মধ্যে শিবু সিংহীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র।

লোকটা জাতে উড়িয়া। একটা চোখ কানা। মাথায় তেল চপ্ চপে লম্বা টেরী।

সিংহীর সে ছিল গুপ্তচর। আশ্রমের যেখানে যা ঘটে সব গিয়ে সিংহীর কাছে রাত্রে শোবার আগে বলে আসত।

সুধীর ওকে দু'চোখে দেখতে পারত না।

বলত—আমার বন্দুক থাকলে ওকে গুলি করে মারতাম। বেটা কানা শয়তান।

শিবুও কেন যেন ওকে দেখলেই পাশ কাটিয়ে পালাত।

আর সুধীরের নামে সিংহীর কাছে বিশেষ কিছু লাগাতও না।

সব চাইতে শান্ত—গো-বেচারা একটু মোটা বুদ্ধির ছেলে শ্যামল ঐ আশ্রমে।

শ্যামল বাংলা বইটা খুলে দুলে দুলে পড়ছিল।

"আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা,
মানুষ আমরা নহি তো মেষ।"

ওপাশে বসে কানু, আশ্রমের আর একটি ছেলে রবারের গুলতি তৈরি করছিল। গম্ভীর গলায় বলে উঠলো, মেষ নস্, তুই একটা আস্ত গাধা।

ঘরের অন্যান্য ছেলেরা সব হো হো করে হেসে উঠল।

সুধীর বলতে লাগল, দেখ শ্যামল। এখন না হলেও মেষ হয়ত আমাদের শীগ্‌গির হতে হবে। দিনরাত পড়া আর পড়া। এই, তোরা এত বোকা কেন বলত। দিবারাত্র গাঁ গাঁ করে বই খুলে চেঁচালেই বুঝি একেবারে বিদ্যে ভুড়ীভুড়ী হওয়া যায়।

পড়ার সময় পড়বে শুধু, খেলার সময় খেলা
সকল সময় পড়লে জেনো বিদ্যা হবে কলা।

বুঝলে গোবর্দ্ধন?

গোবর্দ্ধন বসে বসে বইটা সামনে খুলে রেখে ঝিমুচ্ছিল। সুধীর তার মাথায় একটা 'উড়ন চাঁটি' দিয়ে কথাটা বললে।

গোবর্দ্ধন তাড়াতাড়ি চম্‌কে উঠে আবার পড়া শুরু করে দিল।

ত-র-আর-ণী, তরণী, তরণী মানে নৌকা।

যে নৌকায় চড়ে আমরা বর্ষাকালে যাতায়াত করি।

ত-র-আর-ণী—

সুধীর ওর সাথে কণ্ঠ মিলাল। তরণী মানে নৌকা। যে নৌকায় চড়ে তুমি গোবর্দ্ধন ঘোড়া আর গাধার মত কান যার সেই সিংহী ভব-নদীর পারে যাবে।

ঘরের মধ্যে আবার একটা হাসির ঢেউ জাগল।

গোবর্দ্ধন কিন্তু ততক্ষণে আবার ঢুলতে শুরু করেছে চোখ বুঁজে।

অদ্ভুত ক্ষমতা ওর এমনি করে বসে বসে ঘুমোবার।

সেই জন্যই তো, সুধীর ওর নামের পদবী বদল করে নতুন পদবী দিয়েছে 'গোবর্দ্ধন ঘোড়া।'—

সুধীর এক সময় বলে, —চল সব আজ রাত্রে জেলেদের নৌকা চুরি করে গঙ্গার ভিতর খানিকটা ঘুরে আসা যাক্। যাবি?

সুধীরের কথায় সকলে আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

গঙ্গার বুকে নৌকা ভাসিয়ে ঘুরে বেড়াতে সুধীরের বড় ভাল লাগে। যতীন বললে, কিন্তু আশ্রম থেকে বের হবে কি করে? রাত্রে গেট বন্ধ করে দারোয়ান শুয়ে পড়ে।

তুই যেমনি মোটা তেমনি তোর বুদ্ধিটাও দিন দিন মোটাই হয়ে যাচ্ছে। এত করে বলি রোজ রাত্রে অতগুলো রুটি গিলিস না তা শুনবি নাতো আমার কথা, খা, কত খাবি খা। এরপর নামটাও দেখবি হয়ত মনে করতে পারছিস না। সুধীর বললে।

তারপর যতীনের পিঠে একটা মৃদু চাপড় দিয়ে স্নেহকরুণ স্বরে বললে, আচ্ছা রাত্রে দেখবি কেমন 'চিচিং ফাঁক' তৈরী করে রেখেছি।

আশ্রমে থাকবার ব্যবস্থাটা ওদের ভালই।

ইংরাজী 'E' অক্ষরের মত বাড়িটা, মাঝখানে প্রশস্ত আঙ্গিনা—তার ওদিকে সুপারিনটেনডেন্ট সিংহীর কোয়ার্টার।

তার পিছনে রান্না ঘর—খাবার ঘর ও চাকরদের মহল।

বাড়িটার পূর্ব দিকে গঙ্গা, ছোট ছোট সব পার্টিশন দেওয়া ঘর।

এক একটি ঘরে দুজন করে ছেলে থাকে।

সুধীরের ঘরে থাকে সুধীর ও ভিখু।

ষোল

পলায়ন

সেদিন রাত্রে দুপুরের কথামত আশ্রমের খাওয়া দাওয়া চুকে গেলে সকলে পিছু পিছু এসে সুধীরের ঘরে প্রবেশ করল।

সুধীর সকলকে ঘরে ঢুকিয়ে ভিতর থেকে দরজাটা এঁটে দিল।

গঙ্গার দিককার জানালাটায় পরপর পাঁচটা লোহার শিক খাড়া করে বসান, তারই একটা শিক ঈষৎ উপর দিকে একটু ঠেলে নীচের দিকে টানতেই— জানালার কাঠের ফ্রেম থেকে খুলে এল। সকলে বিস্ময়ে এতক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে সুধীরের কাণ্ড-কারখানা দেখছিল।

সুধীর ওদের দিকে ফিরে হাসতে হাসতে বললে, দেখলি কেমন চিচিং ফাঁক।

ছুরি দিয়ে কাঠ কুরে কুরে ফ্রেমের গর্ত বাড়িয়ে সুধীর শিক খোলবার উপায় করেছিল।

এইবার এই জানলা পথে সবাই আমরা বাইরে যাবো, সুধীর বলে।

প্রকাশ করে তার মতলব।

সকলে তখন সেই শিকের ফাঁক দিয়ে একে একে বাইরে গেল। নিঃশব্দে নীচে হয়ে প্রাচীরের গা ঘেঁসে সকলে আশ্রমের সীমানা পার হয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

আকাশে চাঁদ দেখা দিয়েছে। তার আলোয় চারিদিক যেন স্বপ্নময়।

গঙ্গায় তখন জোয়ার দেখা দিয়েছে।

জোয়ারের টানে গঙ্গার ঘোলাটে জল সাদা সাদা ফেনা ছড়িয়ে কলকল ছলছল করে দুপাড় ভাসিয়ে ছুটছে। খানিকটা দূর এগিয়ে যেতেই দেখা গেল কয়েকটা জেলে ডিঙ্গি পাড়ের সঙ্গে দড়ি দিয়ে খোঁটার গায়ে বাঁধা।

জোয়ারের জলে ছোট ছোট ডিঙ্গিগুলো হেলছে আর দুলছে। সামনেই অল্প দূরে জেলেদের বাড়ি।

বাঁশের মাচানের গায়ে জাল শুকাচ্ছে।

সুধীর আস্তে আস্তে নীচু গলায় বললে, চুপ, সব গোলমাল করিসনে। জেলেরা টের পেলে কিন্তু আর রক্ষা রাখবে না। তোরা সব আস্তে আস্তে গঙ্গার পাড় দিয়ে খানিকটা এগিয়ে যা, আমি নৌকা খুলে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে তোদের তুলে নেব'খন।

পরিপূর্ণ চাঁদের রূপালী আলো গঙ্গার জলের বুকে অসংখ্য ঢেউয়ের গায়ে গায়ে যেন অপূর্ব স্বপ্ন মাধুরী রচনা করে।

সুধীর নিঃশব্দে একটা ডিঙ্গি খুলে নিয়ে এগিয়ে গেল একটু দূরে।

সবাই এসে জমায়েত হয়েছিল একটু দূরে।

সুধীর একে একে সকলকে ডিঙ্গিতে তুলে নিল।

সুধীর হালে বসল আর দু'জন দাঁড় টানতে লাগল। জোয়ারের টানে নৌকা সামনের দিকে এগিয়ে চলে। মাঝে মাঝে গঙ্গাবক্ষের শীতল হাওয়া এসে চোখে মুখে ঝাপটা দিয়ে যায়।

হঠাৎ সুধীর সকলের দিকে তাকিয়ে বলে, আচ্ছা এমনি করে নৌকা বেয়ে আমরা যদি দূরে—অনেক দূরে পালিয়ে যাই। আর আশ্রমে কোন দিনও না ফিরি কেমন হয় বল তো—

সুধীরের কথায় সকলের মুখ যেন ভয়ে চুপসে এতটুকু হয়ে যায়।

গোবর্দ্ধন ভয়ে ভয়ে বলে, ওসব কী কথা সুধীর? সিংহী সাহেব তাহলে আর কাউকে জ্যান্ত রাখবে না।

সুধীর হাসতে হাসতে জবাব দেয়, কোথায় থাকবে তখন সিংহী, আমাদের নাগাল পেলে তো?

পরেশ একটু পেটুক, ঢোক গিলে প্রশ্ন করলে, পালিয়ে যে যাবে কারও কাছে তো পয়সা নেই, খাবে কি ক্ষিধে পেলে?

কেন? নদীর জল আর হাওয়া। অম্লান বদনে সুধীর জবাব দিল। তারপর হাসতে হাসতে বললে, ভয় নেইরে। পালাব না।

সত্যি বলছিস? পরেশ শুধায়।

হ্যাঁ, আর সত্যিই পালাতে যদি কোনদিন হয়ই, তবে একাই পালাব সেদিন, তোদের ল্যাজে বেঁধে পালাবো না।

আশ্রম থেকে পালাবার কথা যে এমনি কথায় কথায় বলছিল সুধীর তা নয়।

সত্যিই আশ্রমে ঐ সিংহীর অত্যাচারে ও যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল।

কেবলই মনে হতো ওর আশ্রম থেকে পালিয়ে যায়। যে দিকে দুচোখ যায় চলে যায়।

কথাটা কিন্তু চাপা রইল না। রাত্রে আশ্রম থেকে পালিয়ে গিয়ে নৌকায় বেড়ানোর কথা কেমন করে না জানি সিংহীর কানে গিয়ে উঠল।

পরের দিন সিংহীর ঘরে যখন সকলের ডাক পড়ল, সকলের বুকই ভয়ে দুর দুর করে কেঁপে উঠল।

ভয়ে সকলের মুখ চুপসে আমসির মত হয়ে গেল।

শুধু নির্বিকার সুধীর। তার যেন কিছুই নেই।

গোবর্দ্ধন এসে শুকনো গলায় বললে, কি হবে সুধীর?

বেশী আর কি হবে? কয়েকটা দিন অন্ধকার ঘরে বাস ও পিঠের উপর কয়েকটি করে বেত্রাঘাত!

সকলে যথা সময়ে বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে সিংহীর ঘরের দিকে রওনা হলো।

সিংহী নিজের ঘরে ক্রুদ্ধ সিংহের মতই হাতদুটো পিছন করে পায়চারি করছিল। সকলে ঘরে ঢুকতে সিংহী ওদের দিকে তাকিয়ে কঠোর কণ্ঠে বললে, সব সার বেঁধে দাঁড়াও।

প্রথমে বিকাশের পালা। তার পিঠের উপর জোরে জোরে কয়েক ঘা বেত পড়তেই সে যন্ত্রণায় কেঁদে উঠলো।

সহসা এমন সময় সুধীর সিংহীর সামনে এসে গম্ভীর স্বরে বললে, ওদের কোন দোষ নেই স্যার। সব দোষ আমার। আমিই ওদের পরামর্শ দিয়ে আশ্রমের বাইরে নিয়ে গিয়েছিলাম, মারতে হয় আমায় মারুন।

সিংহী ভ্রুকুটি করে সুধীরের দিকে তাকাল, তারপর ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠে বললে, ও, তুই পালের গোদা all right —জানতাম, আমি জানতাম।

সিংহী নির্মম ভাবে সুধীরের সর্বাঙ্গে সজোরে বেত চালাতে লাগল।

সুধীর একটি শব্দ পর্যন্ত করলে না।

প্রায় পনের মিনিট ধরে বেত মারবার পর, সিংহী বললে, আজ যা কাল তোর বিচার হবে।

সকলে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

রাত্রি গভীর। আশ্রমের সকলেই যে যার বিছানায় অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

সুধীর আস্তে আস্তে শয্যার উপর উঠে বসল।

নির্মম বেতের আঘাতে তার সর্বাঙ্গ তখনও বিষের জ্বালার মতই জ্বলছিল।

পাশেই অন্য শয্যায় শুয়ে ভিখু, বোধহয় অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

দুপুরেই কারিগর এসে জানালার শিক ফ্রেম বদলে নূতন করে বসিয়ে দিয়ে গেছে। সুধীর একটা পুঁটলিতে কয়েকটা জামা কাপড় বেঁধে আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

রাত্রির আঁধার চারিদিকে যেন গভীর মৌনতায় খাঁ খাঁ করছে।

বারান্দা থেকে সুধীর আশ্রমের আঙ্গিনায় এসে দাঁড়াল।

মাথার উপর রাতের আকাশ, শিয়রে তারার প্রদীপ জ্বালিয়ে শুধু একাকী

জাগে। সমস্ত আশ্রমটা জুড়ে যেন গভীর ঘুমের ঢুলুনি নেমেছে। সুধীর একবার দাঁড়াল।

কত স্মৃতি বিজড়িত এতকালের আশ্রমটা যেন এক অদৃশ্য মায়ার বাঁধনে তাকে পিছন থেকে টানে।

এখানকার ঘর দুয়ার সঙ্গী সাথী মনে মনে সকলের কাছ থেকে সে বিদায় নেয়।

চোখের কোল দুটো জলে ভরে ওঠে। হাত দিয়ে সুধীর চোখ দুটো মুছে নিল।

তারপর ধীরে ধীরে সে আঙ্গিনাটা পার হয়ে গেটের দিকে এগিয়ে চলে।

গেটের কাছে এসে পুঁটলিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে সে মালকোঁচা আঁটতে যাবে, এমন সময় তার কাঁধের উপর কার যেন হাতের স্পর্শ পেয়ে ও চম্‌কে ফিরে তাকাল, পিছনে দাঁড়িয়ে ভিখু।

সুধীরের বিস্মিত কণ্ঠ চিরে একটা প্রশ্ন বেরিয়ে আসে, একি ভিখু?

হ্যাঁ আমি। কিন্তু তুমি এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ সুধীর?

চলে যাচ্ছি ভাই এখান থেকে। যাক ভালই হলো? ইচ্ছা ছিল যাবার আগে তোকে বলে যাবো কিন্তু সাহস হয়নি। পাছে তুই আমায় যেতে কোন রকম বাধা দিস।

তুমি যাচ্ছ? কিন্তু কেন চলে যাবে?

সুধীরের ওষ্ঠপ্রান্তে করুণ একটু হাসি জেগে উঠল। বললে, এখানে আর আমি থাকতে পারলাম না ভিখু। দেখি এতবড় পৃথিবীতে এই আশ্রম ছাড়া আমার আর কোথাও স্থান মেলে কিনা। এই আশ্রমের নিয়ম কানুন, এর অত্যাচারে আমার দম আটকে আসে। এ বন্দী জীবনে আমি অত্যন্ত হাঁপিয়ে উঠেছি। তাই চলে যাচ্ছি।

তারপর হঠাৎ ফিক্ করে একটুখানি হেসে বললে, সিংহীটা খুব জব্দ হবে, কাল যখন সকালে উঠে দেখবে যে খাঁচার পাখী পালিয়েছে, কি বলিস? আমার ভারী ইচ্ছা করছে তখন ওর মুখের চেহারাটা কেমন হয় একবার দেখবার জন্য। যাক আমার বদলে তোরাই দেখিস।

কোথায় যাবে? ভিখু জিজ্ঞাসা করে।

কোথায় যাবো? তা তো জানিনা। আর ভাবনাই বা কিসের? এতবড় দুনিয়ায় জায়গার অভাব হবে কি?

ভিখু চুপ করে থাকে। কোন জবাব দেয় না।

লোহার গেটের মাথায় সব ঘন সন্নিবেশিত ধারালো লোহার শিক বসান। সেই দিকে তাকিয়ে ভিখু প্রশ্ন করে, কিন্তু গেট পেরুবে কেমন করে?

সুধীর একটু হাসল। তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে দারোয়ানের ঘরের পিছনের কামিনী গাছটার তলা থেকে পোল জাম্পের বড় বাঁশের ডাণ্ডাটা নিয়ে এল।

বাঁশটা দেখিয়ে বলে, এই দেখ, সন্ধ্যা বেলা লুকিয়ে এটা এখানে রেখে গিয়েছিলাম।

তারপর পুঁটলিটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে অক্লেশে সুধীর বাঁশের ডাণ্ডাটার উপর ভর দিয়ে গেটের ওপাশে গিয়ে ভল্ট দিয়ে লাফ দিয়ে পড়ল।

গেটের লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে একটা হাত গলিয়ে ভিখুর একখানি হাত সস্নেহে চেপে ধরে ও বললে, এখানে দাঁড়িয়ে থাকিসনে, কেউ হঠাৎ দেখে ফেললে বিপদে পড়বি, যা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়গে যা।

তুই দাঁড়া সুধীর আমিও তোর সঙ্গে যাবো। ভিখু বলে।

পাগলামি করিসনে ভিখু। —কোথায় যাবি আমার সঙ্গে?

তুই যেখানে যাবি।—

না ভাই তুই যা। আচ্ছা আসি—কেমন?

ভিখুর চোখের কোলে দু'ফোঁটা জল চিক্‌চিক্ করে ওঠে।

ছি ভিখু, তুই কাঁদছিস? কাঁদছিস কিরে বোকা ছেলে দূর—

ভিখু মুখ ফিরিয়ে নেয়।

সুধীর ধীরে ধীরে হাঁটতে আরম্ভ করে।

সহসা তারও চোখের কোল দুটো বুঝি জলে ঝাপসা হয়ে ওঠে।

সামনেই পায়ে চলার পথ রাতের আঁধারে থম থম করছে।

হাত দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে সুধীর দ্রুত চলতে থাকে। আস্তে আস্তে একসময় রাতের অস্পষ্ট আঁধারে সুধীরের ক্রম চলমান দেহখানি একটু একটু করে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ভিখু তখনো দাঁড়িয়ে গেটের অপর দিকে।

সতের

পথহারা

রাতের আঁধারে পায়ে চলা পথটা যেন প্রকাণ্ড একটা ঘুমন্ত অজগরের মত নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে।

পথের দুধারের বাড়িগুলো ঘুমের কাঠির ছোঁয়া পেয়ে যেন একেবারে নিশ্চল নিঝুম হয়ে পড়েছে।

কেউ কোথাও জেগে নেই।

একাকী শুধু যেন এ জগতে এক সুধীরই জেগে পথ হেঁটে চলেছে। আর মাথার উপরে কালো আকাশে রাতজাগা তারার দল এই গৃহহারা একাকী নিঃশব্দে চলমান বালকটির দিকে নীরবে তাকিয়ে আছে।

মাঝে মাঝে রাতের হাওয়া চুপিচুপি পথের বাঁকে বাঁকে কী কথা বলে যায়?

পথের ধারে একটা কুকুর গুটি শুটি দিয়ে বুঝি ঘুমিয়েছিল। সুধীরের পায়ের সাড়া পেয়ে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে আবার পেটের মধ্যে মুখটা গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ল।

সুধীর এগিয়েই চলে।

রাস্তার ধারে কয়েকটা রাত জাগা ভিখারী গুণ গুণ করে গল্প করছে।

সুধীর তাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল....।

রাত বাড়তে থাকে....।

হাঁটতে হাঁটতে সে রসা রোড, চৌরঙ্গী, হ্যারিসন রোড প্রভৃতি পার হয়ে একসময় হাওড়ার পুলের উপর এসে দাঁড়াল।

রাত্রি বুঝি শেষ হয়ে এল। আকাশের রং ফিকে হয়ে আসে।

পুলের নীচে গঙ্গার গৈরিক জলরাশি একটানা বয়ে চলে। নৌকা ও স্টীমারের দু'একটা আলো জলের বুকে থির থির করে কাঁপে। মাঝে মাঝে দু'একটা জাহাজ বা স্টীমার চারিদিক প্রকম্পিত করে সিটি দিয়ে ওঠে ভোঁ ও ও! দু'একটা স্টীমলঞ্চ জলের বুকে শব্দ জাগিয়ে ছুটে যায়।

অনেকটা হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত—ক্রমে ওর চোখের পাতা দুটো যেন বুঁজে আসতে চায়।

পা দুটো আর টানতে পারে না—অবশেষে রাস্তারই ধারে একটা গাছের নীচে পুঁটলিটি মাথার তলায় দিয়ে সুধীর সেইখানেই শুয়ে পড়ল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমে চোখ দুটো তার বুঁজে এলো।

পরের দিন যখন সুধীরের ঘুম ভাঙ্গল বেলা তখন অনেক হবে। রৌদ্রালোকিত শহর কর্মের সাড়ায় চঞ্চল।

লোকজন, গাড়ি, ঘোড়া, রিক্সা, বাস এক বিরাট ব্যাপার।

সমস্ত শরীরে ব্যথা। অসহ্য ক্লান্তি।

সুধীর অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে তাকিয়ে তাকিয়ে আশে পাশে শূন্য দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। তারপর উঠে মুখ হাত ধোয়ার জন্য গঙ্গার ঘাটের দিকে চলল।

পা যেন আর চলতে চায় না।

ক্ষিধেও পেয়েছে প্রচণ্ড, ক্ষিধেতে পেটের মধ্যে যেন পাক দিচ্ছে।

সঙ্গে একটি পাই পয়সাও নেই।

শূন্য পকেট একেবারে।

তবু উঠে দাঁড়াল সুধীর।

আবার হাঁটতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে বেলা আটটা নাগাদ বালীতে এসে পৌঁছাল।

পিপাসায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। গঙ্গার ঘাটের দিকে এগিয়ে চলে সুধীর।

ঘাটে স্নানার্থীদের ভিড়।

ধীরে ধীরে জলে নেমে হাত মুখ ধুয়ে আঁজলা করে এক পেট জল খেল।

শরীরটা অনেকটা জুড়াল।

একটু বিশ্রাম করে গঙ্গার ঘাটে আবার হাঁটতে শুরু করে সুধীর গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে।

হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যার দিকে সুধীর শ্রীরামপুর এসে পৌঁছল। সারাটা দিন হেঁটে হেঁটে খুব খিদে পেয়েছে। অথচ সঙ্গে একটি পাই পয়সা নেই।

কী করা যায়?

একদিকে তীব্র ক্ষুধার প্রবল জ্বালা। অন্যদিকে ভবিষ্যতের অনাহারে ক্লান্তিকর দুঃস্বপ্ন। কি করবে সে? বেচারী। এদিকে রাতও ক্রমে বেড়ে চলেছে।

আজকের রাতই বা কাটবে কোথায়? রাতের অন্ধকার তো নয়, কত দুঃখ ও বেদনার দুঃস্বপ্ন যেন বাদুরের মত কালো ডানা ছড়িয়ে সুধীরকে গ্রাস করবার জন্য এগিয়ে আসছে।

আশ্রমের সেই ঘর খানির মধ্যে ভিখুর শয্যার পাশে পাতা আপন শয্যাটির কথা মনে পড়ে।

আর একটু পরেই খাবার ঘণ্টা পড়বে।

ছেলেদের দল সব সার বেঁধে খেতে বসে যাবে।

কে জানত যে,...আশ্রমের বাইরের পদে পদে এত দুঃখ, এত কষ্ট। মনের কোণে কোথায় বুঝি একটা গোপন অনুশোচনা ব্যথার দোলা দিয়ে যায়।

হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার যাত্রী ঘাটে গিয়ে হাজির হলো। প্রকাণ্ড সিঁড়িগুলি ধাপের পর ধাপে বরাবর গঙ্গার বুকে নেমে গেছে।

একধারে প্রকাণ্ড একটা বটগাছ তার অজস্র শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে দিয়ে সুদূর কোন অতীতের সাক্ষী দেয়।

রাতের হাওয়ায় পাতাগুলি ফর-ফর পত্-পত্ পত্র মর্মর তোলে। ওপারে মিলের সার বাঁধা আলোগুলি পিট্ পিট্ করে জ্বলে আর জ্বলে। গঙ্গায় এখন বোধহয় ভাঁটা।

জল অনেক দূর পর্যন্ত নেমে গেছে।

নরম মাটির আস্তরণ বহুদূর পর্যন্ত চক্চক্ করে।

জলে ঢেউ জাগা ও ভাঙ্গার অস্পষ্ট শব্দ কানে আসে।

পুঁটলিটি মাথার তলে দিয়ে সুধীর শুয়ে পড়ল।

এই খোকা, ওঠ, ... ওঠ।..

কার ডাকে সুধীরের ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। ধড়মড় করে সে উঠে বসল।

পূর্বের আকাশে এক অদ্ভুত চাপা লালচে আভা, ভাঙা মেঘের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে।

মাঝরাতে কখন হয়ত ভাটির শেষে জোয়ার এসেছে... জল এখন একেবারে দু'সিঁড়ির নীচে কলকল ছল ছলাৎ করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

এখানে শুয়ে কেন?

সুধীর কী জবাব দেবে, চুপ করে থাকে।

বাড়ি কোথায়?

বাড়ি নেই!

তা আসছো কোথা থেকে?

কলকাতা থেকে।

কী নাম তোমার বাবা?

সুধীর এতক্ষণে ভাল করে মুখ তুলে চাইলে, পাশেই দাঁড়িয়ে এক সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ।

গরদের ধুতি পরিধানে ও গায়ে গরদের উড়ানি।... তারই ফাঁক দিয়ে শুভ্র যজ্ঞোপবীত দেখা যায়।

এইমাত্র বোধহয় স্নান করেছেন। সমগ্র মুখখানিতে গভীর স্নিগ্ধ প্রশান্তি।

তোমার নাম কি?

আমার নাম পান্নালাল চৌধুরী।..... সুধীর নাম গোপন করলে।

তোমার মা বাবা, কিম্বা কোন আত্মীয় স্বজন নেই?

কেউ নেই।

এতদিন কোথায় ছিলে?

এক ভদ্রলোকের বাড়িতে। এবারেও সুধীর ইচ্ছা করেই আসল কথাটা গোপন করলে।

তা সেখান থেকে চলে এলে কেন?

তারা থাক্‌তে দিল না।

কেন?

বললে, বসে বসে খাওয়াতে পারব না।

ভদ্রলোক হাসলেন, কেন? তুমি বুঝি বসে বসে খেতে শুধু?

হ্যাঁ।

তা এখন কি করবে ঠিক করেছ?

জানিনা।

আচ্ছা এখন আমার সঙ্গে আপাতত আমার বাড়িতে চল। যাবে?

যাবো।

তবে চল। ওঠো।

সুধীর উঠে দাঁড়াল। রাস্তার উপর ভদ্রলোকের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল।

ভদ্রলোক গাড়িতে নিজে উঠে সুধীরকেও উঠতে বললেন।

ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল।

যেতে যেতে সে ভাবছিল এতক্ষণ হয়ত আশ্রমের মধ্যে তার পলায়নের ব্যাপার নিয়ে একটা রীতিমত সাড়া পড়ে গেছে।

সিংহী তার কালো মুখখানাকে হাঁড়ির মত করে নিস্ফল আক্রোশে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

ছেলের দল হয়ত কত রকমের কানা ঘুষো করছে।

পরমেশবাবুর বাড়িতে সুধীর আশ্রয় পেল।

পরমেশবাবুর বিধবা মেয়ে রমা সুধীরকে বুকে টেনে নিল।

এক ছেলে ছিল তার সুনীল—হলো দুই ছেলে—পানু আর সুনীল।

পরমেশবাবুর অবস্থা খুবই ভাল।

শ্রীরামপুর শহরে দুইখানি বাড়ি ভাড়া খাটে তাছাড়া বিরাট চাল ডালের ব্যবসা ও তেলের কল।

সংসারে ঐ বিধবা মেয়ে রমা ও একমাত্র দৌহিত্র সুনীল।

আঠার

বিদায়

কত তুচ্ছ ঘটনা থেকে এক এক সময় মানুষের জীবনে আকস্মিক কত বড় পরিবর্তনই না আসে। ঠিক তেমনি—

সুধীর পরমেশবাবুর আশ্রমে এসে একেবারে হঠাৎ যেন রাতারাতি বদলে গেল।

তার সেই দুরন্ত চঞ্চল প্রকৃতি একেবারে শান্ত হয়ে গেল।

অদ্ভুত ঠাণ্ডা হয়ে গেল যেন সে।

পরমেশবাবু তাকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। পড়ায় মন দিল সুধীর।

গভীর মন দিল।

তবু মাঝে মাঝে মনটা যেন কেমন উতলা হয়ে যায়।

একটা শূন্যতা যেন চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে। মনে হয় কি যেন তার ছিল—

কি যেন সে হারিয়েছে। আর মধ্যে মধ্যে মনে পড়ে সেই হরমোহিনী আশ্রমের কথা—ভিখুর কথা বিশেষ করে।

এক এক সময় কিন্তু ভাল লাগে না।

পড়ার বই—পরমেশবাবুর এই গৃহ, কিছু ভাল লাগে না।

চলে যায় সুধীর গঙ্গার ঘাটে।

বাঁধান সিঁড়িতে চুপটি করে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

আবার কখন কখন মনে হয় বের হয়ে পড়ে সে এখান থেকে।

এই ঘর আর স্নেহের বাঁধন তার জন্য নয়।

ভগবান শৈশব থেকেই যে ঐ বাঁধন থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছেন।

গঙ্গার ঘাটে জোয়ারের জল এসে পুরাতন ভাঙ্গা সিঁড়িগুলো ডুবিয়ে দেয়। মৃদুমন্দ বাতাসে গঙ্গার বুকে ছোট ছোট ঢেউগুলো সিঁড়ির গায়ে আছড়ে আছড়ে এসে পড়ে। অধীর ব্যাকুল আগ্রহে বারংবার মনের কোণ ছুঁয়ে যেন কাদের অস্পষ্ট হাতছানি ভেসে ওঠে।

কারা যেন ডাকে, আয় আয়।

সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে পড়ে মায়ের ব্যাকুল সদা শঙ্কিত মুখচ্ছবি।

অশান্ত মনও গুটিয়ে আসে।

নানারঙের পাল তুলে নৌকাগুলি জলের বুকে ভেসে চলে, দেশ দেশান্তরে। কোথায় তাদের যাত্রা শুরু কোথায় বা তার শেষ, কে জানে।

কোন হট্টমালার দেশে চলেছে তাদের তরী।

বাতাসে ঘাটের ধারে বট গাছের পাতায় সিপ সিপ করে জাগে দোলন।

পাতায় পাতায় কী যে কথার কানাকানি।

ওপারের মিলের চিমনীর ধোঁয়া আকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়ে।

আজ কয়দিন থেকেই সুনীল যেন বেজায় অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

সদা চঞ্চল মন যেন তার হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

বাইরে বাইরে কাটাবার সময়টা যেন ক্রমে দীর্ঘতর হয়ে উঠেছে।

সুনীলের এই পরিবর্তন কিন্তু পানুকে বিচলিত করে। এ তো স্বাভাবিক সুনীল নয়। হাসির সেই অফুরন্ত উচ্ছ্বাসই বা কোথায়। কোথায় সেই দুর্মদ চলার বেগ।

এ বুঝি আসন্ন এক ঝড়ের অবশ্যম্ভাবী পূর্ণ সঙ্কেত। শেষ পর্যন্ত হলোও তাই।

অকস্মাৎ সত্য সত্যই সুনীল একদিন কোথায় চলে গেল। মায়ের স্নেহের বাঁধন, ঘরের মায়া কিছুই তাকে পিছুটান দিয়ে বেঁধে রাখতে পারলে না।

যাযাবর মন তার নীড়ের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে চলে গেল।

সকাল বেলায় ঘুম ভেঙ্গে পানু পাশের খাটের দিকে চেয়ে দেখলে বিছানার চাদরে একটি কুঞ্চন পর্যন্ত নেই। নিভাঁজ শয্যা কেউ বুঝি স্পর্শও করেনি।

একই ঘরে ওরা দুটি ভাই পাশাপাশি শয়ন করত।

বিস্মিত পানু উঠে দাঁড়াল।

হঠাৎ নজরে পড়ে পানুর, সুনীলের পড়বার টেবিলে মহীশূরের চন্দন কাঠের ছোট্ট হাতীটা দিয়ে চাপা সুনীলের প্যাডের সবুজ কাগজ একখানি ভাঁজ করা। উপরে বড় করে লেখা ‘মা’।

কম্পিত হাতে পানু ভাঁজ করা কাগজটা খুলে ধরল।

ভোরের প্রথম সোনালী আলো খোলা জানালা পথে ওধারের নিমগাছটার ফাঁকে ফাঁকে প্রথম প্রণতি জানাচ্ছে।

সুনীল লিখেছে।

মা! মাগো আমার, আমার মা-মণি।

আমি চল্লাম।

এমনি করে আর আপনাকে গুটিয়ে ঘরের কোণে বসে থাকতে পারলাম না।

দেশে দেশে নগরে নগরে সমুদ্রের কুলে কুলে যে স্বপ্ন আছে ছড়িয়ে দিক্ দিগন্তে, ঘুমের মাঝে, জাগরণে দিবানিশি তারা হাতছানি দেয়, আয়, ওরে অশান্ত, ওরে আপন ভোলা, ওরে খেয়ালী চঞ্চল আয়...আয়।

আপাতত বিলেত চললাম—জাহাজে খালাসীর কাজ নিয়ে।

আমার জন্য ভেবো না, দুঃখ করো না, মা—মণি।

এমনি করে ঘরের মধ্যে আমি বন্দী থাকতে পারলাম না। ঘরের বাইরে যে জীবন প্রতি মুহূর্তে সেই জীবন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

কিন্তু তুমি ভেবো না মা।

তোমার সুনীল আবার তোমার কোলে ফিরে আসবে।

তোমার চির অবাধ্য সন্তান

সুনু

পানুর চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঃ সুনীল, সীমাহীন সমুদ্র পথে সুনীলদের জাহাজ ভেসে চলেছে।

কত দেশে—কত বন্দরে ভিড়বে হয়ত জাহাজ।

কত সমুদ্র পার হবে সে—

সেও যদি পারত আজ অমনি করে সুনীলের মত ভেসে পড়তে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের পাতায় ভেসে ওঠে মার বিষণ্ণ মুখখানি—

সুনীল চলে গেছে মাকে সে কেমন করে বলবে।

কেমন করে দেবে সংবাদটা।

উনিশ

গোপন কথা

সংবাদটা চাপা রইলো না। ক্রমে একান ওকান হতে হতে শ্রীলেখাও একদিন শুনল যে সে শশাঙ্ক চৌধুরী ও বিভাবতীর নিজের মেয়ে নয়।

এতদিন চোরের মতই চুরি করে তাদের স্নেহ ও ভালবাসা ভোগ করে এসেছে।

এই বিশাল জমিদারী, মূল্যবান ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে আসবাবপত্র, কাপড় জামা, খেলনা, গয়নাগাঁটি কিছুতেই তার অধিকার নেই, সে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। একদিন যাকে প্রাণ ভরে মা বলে ডেকে ডেকে আশ মেটেনি, সে মাও তার নিজের মা নয়। তার উপরে আজ তার কোন অধিকার নেই।

এ বাড়ীর সামান্য একটা ভৃত্যেরও যে অধিকার এখানে আছে তার আজ সেটুকুও নেই। শ্রীলেখা স্তব্ধ হয়ে গেল। বোবা হয়ে গেল যেন।

একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ যেন তার ভিতর দিয়ে ছুটে গিয়ে দেহের সমস্ত কলকব্জাগুলো মুহূর্তে বিকল করে দিয়ে গেছে।

দুপুরের পড়ন্ত রোদে বাগানের পাতাবাহারের গাছগুলো যেন ঝিমুচ্ছে। একটা পড়বার বই খুলে শ্রীলেখা নিজের ঘরে চুপটি করে বসে ছিল।

খোলা জানালা পথে দেখা যায় গেটের ধারের প্রকাণ্ড কৃষ্ণচূড়া গাছটায় যেন লাল আগুনের আভা ছড়িয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে দ্বিপ্রহরের ক্লান্ত নির্জনতায় অশান্ত ঘুঘুর একঘেয়ে সুর ভেসে আসে।

ফট্‌ফট্ করে জাপানী চপ্পলের সাড়া জাগিয়ে সুধীর এসে ঘরে প্রবেশ করল।

আজকের সুধীরকে যেন আর চেনাই যায় না। দামী সিল্কের বেশভূষায় ও জমিদার বাটির দুধ, ঘি—সরে পনের দিনেই তার ভোল গেছে সম্পূর্ণ বদলে। সিল্কের সার্ট গায়ে। পরিধানে সিল্কের ঢোলা পায়জামা।

কিরে শ্রী কি করছিস?

শ্রীলেখার পরিপাটি করে বিছান শয্যায় নিজের দেহভার ছড়িয়ে দিতে দিতে সুধীর প্রশ্ন করল।

মাথার কাছে টিপয়ে একটা সুদৃশ্য কারুকার্য খচিত রূপার বাটীতে চকলেট রয়েছে, তার থেকে কয়েকটা তুলে মুখে দিয়ে বলল, এসব কিনে পয়সা নষ্ট করিস কেন? এ বয়সে পয়সা নষ্ট করবার বাতিকটা বড্ড খারাপ।

শ্রীলেখার চোখে জল এসে পড়ে।

শ্রীলেখার মনে পড়ে কখনো মা বাবার কাছে কোন দিন কোন দাবী জানায় নি বলে মা বাবার কাছে কত অনুযোগ তাকে শুনতে হয়েছে, চকলেট খেতে ভালবাসে বলে মা নিজেই রোজ চকলেট এনে রেখে যান।

আজ তার কৈফিয়ৎ দিতে হচ্ছে। দিতে তো আজ তাকে হবেই কৈফিয়ৎ, কে সে এখানকার, কি তার দাবী?

সুধীর বলে চলে, এমনি করে আর পয়সা নষ্ট করা চলবে না, আর এমনি করে পয়সা নষ্ট করলে কয়দিন জমিদারী চলবে? দুদিনেই তচনচ হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে।

শ্রীলেখা চুপ।

গায়ে তোর ওটা কিসের জামা রে? মুর্শিদাবাদ সিল্কের বুঝি? এত বাবুগিরী কেন? সাধারণ ছিটের জামাই তো যথেষ্ট।

গভীর রাত্রে বিছানায় শুয়ে শ্রীলেখা ছটফট করে। যে মাকে সে কোনদিন দেখেনি, জ্ঞান হওয়া অবধি যার কথা কোন দিনের জন্য একটিবারও শোনেনি, সেই অদেখা, অচেনা, অজানা মার জন্য চোখের কোল বেয়ে আজ তার অশ্রু ঝরে। মা, মাগো কোন অপরাধে এমনি করে আজ আমায় নিঃস্ব একাকী সংসার সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে গেলে মা।

শ্রীলেখা যেন চোরের মত বাড়িতে আছে। নিঃশব্দে যেন সকলের দৃষ্টি থেকে নিজেকে সর্বক্ষণ আড়াল করে রাখতে সচেষ্ট। এমন কি বিভাবতীর কাছেও যায় না। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

সেদিন বিভাবতী ধরে ফেলেন শ্রীলেখাকে।

শ্রী—

শ্রীলেখা সাড়া দেয় না। মাথা নীচু করে থাকে।

বিভাবতী শ্রীলেখাকে আপন বুকের উপরে টেনে গভীর স্নেহমাখা সুরে জিজ্ঞাসা করেন, কি হয়েছে মা তোর? দিনরাত গম্ভীর হয়ে থাকিস্ কেন?

কই কিছুই তো হয়নি, শ্রীলেখা জবাব দেয়।

তোর আগেকার সেই হাসি কোথায় গেল মা।

কেন মা? আমি তো হাসি, শ্রীলেখা ম্লান কণ্ঠে জবাব দেয়।

ওরে তুই আগেও যেমন আমার মেয়ে ছিলি এখনও তেমনিই আছিস...।

শ্রীলেখার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বিভাবতী বলেন।

হঠাৎ আচমকা শ্রীলেখা প্রশ্ন করে বসে, আমার—সত্যিকারের মা বাবার কি কোন খোঁজই জান না মা তোমরা?

না।...

শ্রীলেখা চুপ করে থাকে।

কিন্তু কেন, ওকথা জিজ্ঞাসা করছিস কেন? কি হবে তোর সে কথা জেনে? আমরাই তোর মা বাপ।

রাত্রি বোধ করি অনেক হবে।

সুধীর জেগেই ছিল, কে যেন তার শয়ন ঘরের বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু টোকা দেয়, টুক্ টুক্।....

সুধীর কান খাড়া করে শোনে, আবার শব্দ হয়... টুক... টুক।

এবারে সুধীর নিঃশব্দে উঠে দরজার খিল খুলে দেয়। আপাদমস্তক ভারী চাদরে ঢাকা এক ছায়ামূর্তি এসে ঘরে ঢোকে।

মূর্তিই ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

কিরে, কিছু জোগাড় করেছিস?

হ্যাঁ, শ পাঁচেক টাকা মার ক্যাসবাক্স থেকে চুরি করে রেখে দিয়েছি।

বিছানার তলা থেকে দশটাকার পঞ্চাশখানি নোট সুধীর বের করে মূর্তির হাতে নিঃশব্দে গুঁজে দেয়।

লোকগুলো সব কেমন? ছায়ামূর্তি প্রশ্ন করে।

ভয়ানক বোকা। সুধীর জবাব দেয়।

মেয়েটা? আবার ছায়ামূর্তি জিজ্ঞাসা করে।

গোলমাল করেনি। আর করবেও না বোধ হয়।

কিন্তু সুধীর ও সেই ছায়ামূর্তি জানতেও পারে না, তাদের সব কিছু লক্ষ্য করছে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আর এক ছায়ামূর্তি, ওদের সব কথাই তার কানে যায়।

এক সময় প্রথম ছায়ামূর্তি ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কুড়ি

মায়ের প্রাণ

রমা যখন সুনীলের গৃহত্যাগের সংবাদ পেল তখন একটি শব্দও তার গলা দিয়ে বের হল না। শুধু ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল গভীর বেদনায়।

পানু এসে মার কাছে দাঁড়াল, দুঃখ করো না মা—দাদা আবার ফিরে আসবে—

গভীর স্নেহে রমা পানুকে বুকের কাছটিতে টেনে নিল, আমি জানতাম এমনি করে একদিন আমায় সে কাঁদিয়ে যাবেই। তাকে ঘরে বেঁধে আমি রাখতে পারব না।

আবার দুফোঁটা জল গাল বেয়ে নেমে আসে।

হঠাৎ যেন একটা দমকা হাওয়ার ঝাপটায় এবাড়ির হাসির প্রদীপটা নিভে সব কিছু আঁধারে ভরে গেছে।

সুনীল নেই।

জীবনের সেই সদা চঞ্চল সহজ উচ্ছলতার ঝর্ণাধারাও যেন শুকিয়ে গেছে।

পানু আরো গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

এমন সময় আচম্বিতে পানুর জীবনে একটা ঝড় বয়ে গেল।

সেদিন রমা দুপুরে অলস নির্জনতায় মেঝের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে তার পলাতক পুত্রের জন্য চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে। পরমেশবাবু এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। হাতে তাঁর অনেকদিনকার একখানি পুরাতন সংবাদপত্র।

রমা, পরমেশবাবু ডাকলেন।

কে, বাবা? রমা ধড়ফড় করে উঠে বসল।

আবার তুই কাঁদছিলি মা। ... এতে যে তোর ছেলেরই অমঙ্গল হয় মা। কেন দুঃখ করিস? কারও ছেলে কি বিদেশে যায় না? ওদের দেশের ছেলেরা যে মায়ের আঁচল ছেড়ে ওর চাইতেও অল্প বয়সে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়। আকাশের বুকে পাড়ি জমায়। নতুন দেশের সন্ধানে বের হয়। কই, তাদের মায়েরা তো এমনি করে চোখের জল ফেলে না। বরং হাসি মুখে ছেলেকে বিদায় দেয়, বিপদের মাঝে ছুটে যেতে। আজ তোরাই তো মায়ের দল স্নেহের গণ্ডী দিয়ে বাংলা দেশের ছেলে মেয়েগুলোকে পঙ্গু করে তুলেছিস। অথচ একদিন তোদেরই দেশের মা জনা প্রবীরকে অর্জুনের

বিরুদ্ধে নিজহাতে রণসাজে সাজিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁরাও তো মা ছিলেন।

বাবা—

তাঁদের বুকেও তোদের মতই মাতৃ-স্নেহের নিরন্তর ফল্গুধারা বয়ে যেত।

সবই তো বুঝি বাবা, কিন্তু মন যে মানে না। রমা জবাব দেয়।

সে তো আবার তোরই বুকে ফিরে আসবে মা। আমি বলছি সে আবার আসবে। আমাদের ভুলে কি সে থাকতে পারে? তোর বুকভরা স্নেহের আকর্ষণই একদিন আবার তাকে শত আপদ বিপদের বেড়াজাল ডিঙিয়ে তোর কাছে এনে পৌঁছে দেবে। শেষের দিকে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরও যেন অশ্রু সজল হয়ে ওঠে।

জানি না বাবা সে আর আসবে কিনা, তবে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করব, রমা শুধু ম্লান স্বরে বলে।

শোন, তোকে একটা জিনিষ দেখাতে এসেছিলাম মা, বলতে বলতে পুরাতন সংবাদ পত্রখানি পরমেশ বাবু মেয়ের সামনে ধরলেন।

এটায় কি আছে বাবা? রমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পরমেশবাবুর মুখের দিকে তাকায়।

লাল পেনসিল দিয়ে দাগ দেওয়া একখানি ছেলে হারিয়ে যাওয়ার বিজ্ঞাপনের দিকে পরমেশবাবু রমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

রমা আগ্রহে বিজ্ঞাপনটা আগাগোড়া পড়ল।

তুমি কি বলতে চাও বাবা? রমা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে তাকাল।

বছর পাঁচেক আগে পানুকে আমরা কি ভাবে পেয়েছিলাম গঙ্গার ঘাটে, মনে আছে নিশ্চয়ই মা তোমার? পরমেশবাবু বললেন।

রমা স্তব্ধ. হয়ে গেল।

পরমেশবাবু মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছো, পানুর ডান ভ্রুর নীচে একটা লাল জরুল আছে। এবং তার গলায় যে কবচটা তোমার কাছে আছে হয়ত তাতেই তার পরিচয় পত্রটাও পাওয়া যাবে। সত্যি যদি পানু জমিদার শশাঙ্কমোহন চৌধুরীর হারিয়ে যাওয়া ছেলেই হয়, তবে তো আমাদের উচিত তাকে তার মা বাবার হাতে তুলে দেওয়া। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ থেকে তাকে তো আমরা বঞ্চিত করতে পারি না মা।

বাবা। আর্তস্বরে রমা চিৎকার করে উঠল।

জানি মা সব জানি। বুঝি সব। পরমেশবাবু বলতে লাগলেন, পুত্রের মতই এ-কয় বছর তাকে তুমি বুকে করে আগলে এসেছো। আজ তাকে বিদায় দিতে বুক তোমার ভেঙে যাবে, কিন্তু আজ যদি তুমি সেই লালন-পালনের স্নেহের দাবীতে তাকে তোমার কাছে আটকে রাখতে চাও

সে কি অন্যায় হবে না? ভেবে দেখ, তোমার মঙ্গল স্নেহ দাবী তাকে তার জীবনের সব চাইতে বড় পাওয়া থেকে বঞ্চিত করছে।

কিন্তু যে মা তাকে তার জন্ম মুহূর্তে—রমা বলতে লাগল, —তার স্নেহ থেকে বঞ্চিত করে একদা এক অচেনা অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দিতে পেরেছিল—আজ এই দীর্ঘ ষোল বছর পরে তার স্নেহ যদি তার সেই হারান ছেলের উপরে জেগেই থাকে তবে তার কতটুকু মূল্য আছে? না, আমি পানুকে ছাড়তে পারব না বাবা। সুনুকে হারিয়ে ওর মুখ চেয়েই যে আমি বাঁচবার চেষ্টা করছি বাবা।

ভেবে দেখ রমা, বড় হয়ে ও যদি কোনোদিন একথা জানতে পারে যে ও এক মস্তবড় জমিদারের ছেলে হয়েও জন্ম গরিবই রয়ে গেল এবং সেদিন যদি ওর মনে হয় এর জন্য তুমি আর আমিই দায়ী?

না বাবা—না—ও কখন তা ভাববে না—

শোন মা। তোমার কথা ভেবেই এতদিন মুখ বুঁজে ছিলাম। গত সপ্তাহে ওই বিজ্ঞাপন যখন চোখে পড়ে সেই দিনই দুপুরে একান্ত কৌতূহল বশেই আমার বাক্স থেকে পানুর গলার সেই কবচটা খুলে নিয়ে ওই বিজ্ঞাপন দাতার সঙ্গে দেখা করি। এবং তাঁর কাছেই পানুর পূর্বজীবন সম্পর্কে সব শুনে এসেছি।

বাবা·--

হ্যাঁ মা, পানুর বাবা শ্রীপুরের মস্তবড় জমিদার। কিন্তু এসব জানার পর আর তো ওকে আমাদের কাছে ধরে রাখা যায় না। এবারে ওকে ওর মা বাবার কাছে পৌঁছে দেওয়াই কর্তব্য আর তুমি ওর মা সম্পর্কে যে দোষারোপ করছো, আসলে তিনি নির্দোষ। ওর জন্ম মুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্রই ওর এই ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ।

পরমেশবাবু একে একে কিরীটী ও সুব্রতর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর পানুর জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে যা যা শুনেছিলেন সব রমার কাছে খুলে বললেন।

এবারে কিন্তু রমা চুপ করেই রইল বরং পানুর প্রতি পূর্বস্নেহ তার আরো গভীর হলো। আহা বেচারী, শিশুকালে মা থাকতেও মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

কিন্তু একটা কথা। পরমেশবাবু বলতে লাগলেন, পানুকে তার পূর্ব জীবনের সব কথা তোমাকেই খুলে বলতে হবে এবং একথাও বলতে হবে যে শীঘ্র তাকে সেখানে ফিরে যেতে হবে।

আমি! শরাহত পাখীর মতই রমা চীৎকার করে উঠলো, ক্ষমা করো বাবা, আমায় ক্ষমা করো, আমায় এ অনুরোধ করো না, বরং তুমিই বলো।

অগত্যা পরমেশবাবুই পানুকে সকল কথা খুলে বলতে রাজী হলেন।

একুশ

আসল নকল

পরমেশবাবুর মুখে নিজের সমস্ত জন্মবৃত্তান্ত শুনে পানু কিন্তু পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে রইল।

রমা সেই ঘরেই জানালার একটা শিক ধরে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

—আজ তার চোখের জলও বুঝি শুকিয়ে গেছে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পানু মার কাছে উঠে এল।

দুই হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে শুধু বললে, না মা, জন্ম থেকে মার কোন পরিচয় পাইনি এবং শিশু বয়সে যে পালিতা মার সামান্য কয়দিনের জন্য ভালাবাসা পেয়েছিলাম, সেও একদিন অক্লেশে আমায় ভুলে গেল। তাই আজ বুঝতে পারছি কেন সে আমায় ভুলে গিয়েছিল... সে আমার নিজের মা নয় বলেই। জ্ঞান হবার পর জীবনে সত্যিকারের মাতৃস্নেহ তোমার কাছে থেকেই পেয়েছি। তুমিই আমার সত্যিকারের মা। তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না মা। তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই—

কিন্তু পানু—তারা যে তোর আপনজন—

না। কেউ নয় তারা আমার। কেউ আজ আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

রমার দু'চোখের কোল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

নীরবে গভীর স্নেহে রমা পানুর মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

পরমেশবাবুরও চোখে জল।

দু'তিন দিন ধরে ক্রমাগত পরমেশবাবু পানুকে সমস্ত ব্যাপারটা বোঝাতে লাগলেন। এবং আরো বললেন বিবেচনার যে আরো একটা দিক আছে। আইন। সেটাকে যে সকলেরই মেনে চলতে হবে। অগত্যা পানুকেও মত দিতে হলো।

অশ্রু সজল চোখে রমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পানু একদিন পরমেশবাবুর সঙ্গে কিরীটীদের ওখানে এসে উঠল।

শশাঙ্কবাবুকে আসবার জন্য কিরীটী আগে থেকেই ফোন করে রেখেছিল।

শশাঙ্কবাবু এলে কবচসহ আসল ছেলেকে কিরীটী তার হাতে তুলে দিল।

কবচটি পানুর হাতে বাঁধা ছিল—রূপার চ্যাপটা কবচ। কবচের ভিতরেই

ছোট্ট একটা কাগজে লেখা ছিল —সুধীর শ্রীপুরের জমিদার শশাঙ্কমোহন চৌধুরীর ছেলে।

শশাঙ্কমোহন ছেলেকে বুকে টেনে নেন।

তারপর পুত্রসহ শশাঙ্ক চৌধুরী শ্রীপুর ফিরে এলেন।

শ্রীপুর জমিদার গৃহে হুলস্থূল পড়ে গেল।

আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী, গোমস্তা কর্মচারী সকলেই ফিস্‌ফিস্ করে কানাকানি করতে লাগল। এই সেদিন একজনকে এনে বললে, জমিদারের মেয়ে হয়নি ছেলে হয়েছিল। ঐ তার ছেলে। আজ আবার বলছে সে ছেলেও নকল। আসল ছেলে এই।

শ্রীলেখাও চমৎকৃত হল।

মৃগাঙ্গমোহন ক্রুর হাসি হেসে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন।

আর আগেকার সুধীর।

স্তব্ধ হয়ে পানু একটা ঘরে বসে তার আকস্মিক ভাগ্য বিপর্যয়ের কথাই ভাবছিল।

আসন্ন সাঁঝের আঁধারে ধরণীর বুকখানি আবছা হয়ে আসছে।

ঐ বাড়ির সকলেই যেন তাকে সন্দেহের চোখে দেখছে, একমাত্র শশাঙ্ক চৌধুরী ও বিভাবতী ছাড়া।

নিঃশব্দে পানুরই সমবয়সী ফিট্‌ফাট্ একটি ছেলে ঘরে এসে ঢুকল।

পানু চমকে মুখ তুলে তাকাল, কে?

আমি এক নম্বর সুধীর। একটা চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল। তারপর যাদু, কোন গগন থেকে নেমে এলে মাণিক। দুই নম্বর—

বলতে বলতে ছেলেটি হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপে ঘরের আলোটা জ্বেলে দিল। মুহূর্তে ঘরের আবছা অন্ধকার সরে গিয়ে আলোর ঝরণায় ঘরটি হেসে উঠল।

কিহে চুপ করে আছ কেন? ছেলেটি আবার প্রশ্ন করলে, বল না সোনার চাঁদ। তা' দেখ বাপু। এসেছো বেশ করেছো। কিছু নিয়ে রাতারাতি সরে পড়। না হলে প্রাণ নিয়ে কিন্তু টানাটানি হবে। শোন বলি—ফটিকচাঁদ সব সহ্য করতে পারে, শুধু ভাগের বখরা সহ্য করতে পারে না।

পানু ফ্যাল ফ্যাল করে ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এখানে আসবার আগে ওর নাম ভাঁড়িয়ে আর একটি ছেলে যে এখানে এসেছে তাও আগেই শুনেছিল, তা'হলে এই সে।

কিহে, চুপ করে রইলে কেন? জবাব দাও। অসহিষ্ণু ভাবে ফটিকচাঁদ বললে।

বাইরে শশাঙ্কমোহনের চটির শব্দ শোনা গেল।

ফটিকচাঁদ পালাবার চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না। থমকে শশাঙ্কমোহনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল।

দেখ তোমার নাম কি বলত? শশাঙ্কমোহন প্রশ্ন করলেন।

আজ্ঞে সুধীর চৌধুরী, ভয়ে ভয়ে ফটিকচাঁদ জবাব দিল।

থাম ছোকরা। শশাঙ্কমোহন বিরাট এক ধমক দিয়ে উঠলেন, আমি তোমার আসল নাম জানতে চাইছি।

আজ্ঞে ওটাই তো আসল নাম। মানুষের নামের আসল নকল থাকে নাকি?

বাঃ? এর মধ্যেই যে বেশ পরিপক্ক হয়ে উঠেছো দেখছি।

আজ্ঞে—

যাক—শোন, তোমার কোন ক্ষতি আমি করতে চাই না। শুধু যারা তোমাকে এখানে সুধীর সাজিয়ে এনেছিল তাদের সত্যকার নামধামটা জানতে চাই—

আমি জানিনা কিছু—

জান—আর এখানে ভালয় ভালয় সব কথা না বললে থানায় গিয়ে সবই বলতে হবে জেনো—

থানা?

ফটিকচাঁদের চোখ গোল গোল হয়ে ওঠে।

তা থানা ছাড়া কোথায় তুমি যাবে। জোচ্চুরী করে মিথ্যা পরিচয়—

আজ্ঞে—দোহাই আপনার আমাকে পুলিশে দেবেন না—সব কথা আমি বলব।

বেশ চল তবে আমার ঘরে।

ফটিকচাঁদকে নিয়ে শশাঙ্কমোহন ঘরে থেকে বের হয়ে গেলেন।

বাইশ

দুর্যোগের মেঘ

ফটিকচাঁদ ভয়ে ভয়ে সত্যি কথাই বললে।

বললে, কিশোরীমোহন আর জগন্নাথই তাকে এখানে সুধীর সাজিয়ে এনেছে। তাঁদের সঙ্গে কথা ছিল যতদিন না সত্যিকারের পরিচয়টা তার প্রকাশ হয়ে পড়ে—মধ্যে মধ্যে যা পারে হাতিয়ে দেবে তাদের এখান থেকে সে।

হুঁ—আজ পর্যন্ত কত দিয়েছো?

তা হাজার তিন-চার টাকা ও গহনায় হবে।

শশাঙ্কমোহন ফটিকচাঁদকে আর ঘাঁটালেন না।

তবে থানায় অশোকের হেফাজতে পাঠিয়ে দিলেন।

পানু নিজেই পর দিন যেচে এসে শ্রীলেখার সঙ্গে ভাব করলে। শ্রীলেখা নিজের ঘরে একটা উলের কী বুনছিল। পানুকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে ও মুখ তুলে চাইল।

তোমার নামই বুঝি শ্রীলেখা? পানু জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ—

বেশ নামটি তোমার। তুমি তো বয়সে আমার সমানই। বড় ইচ্ছা ছিল মনে মনে একটি বোনের। ভাই ফোঁটার দিনটা এমন বিশ্রী লাগত। দাদার তো এই বোন না থাকার জন্য অভিযোগের অন্ত ছিল না।

দাদা কে? শ্রীলেখা জিজ্ঞাসা করল।

পানু সুনীলের সব কথা তখন শ্রীলেখার কাছে আগাগোড়া বললে, শেষের দিকে তার চোখে জল এসে গেল এবং চেয়ে দেখলে শ্রীলেখার চোখেও জল। অল্প সময়ের মধ্যে দু'জনার খুব ভাব হয়ে গেল।

পাথুরিয়াঘাটার একটা এঁদো গলির মধ্যে বহুদিনকার একটা পুরাতন বাড়ি। তারই একটা স্বল্পালোকিত ঘরে বসে কয়েকজন লোক কী সব গোপন পরামর্শে রত। ঘরের এক কোণে একটা ভাঙা হ্যারিকেন। আলোর চাইতে ধুমোদ্গীরণই হচ্ছে বেশী।

চুনবালি খসা চিত্র বিচিত্র দেওয়ালের গায়ে হ্যারিকেনের ক্ষীণ অস্পষ্ট

আলোর ছায়া কী এক ভৌতিক বিভীষিকায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। বাইরে যেন দরজার গায়ে শব্দ হলো খট্‌খট্‌। একজন উঠে দরজাটা খুলে দিল।

খোলা দরজা দিয়ে ভিক্ষুকবেশী কে একটা লোক ঘরে এসে প্রবেশ করল। লোকটার পরণে এক শতছিন্ন ময়লা নোংরা ধূতি। মাথার চুলগুলি রূক্ষ্ম এলোমেলো। একটা চোখ ন্যাকড়া দিয়ে বাঁধা। পায়েও একটা পট্টি জড়ান।

দলের একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, কি খবর সর্দার?

খবর ভাল, লোকটা চাপা গলায় বললে। তারপর মাথায় পরচুলটা খুলতে খুলতে দলের একজনকে বললে, আলোটা একবার এদিকে নিয়ে আয়ত সোনা।

একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ায় বাঁধা কী একটা বস্তু লোকটা গিঁট খুলে বের করতে লাগল।

এক টুকরো কাগজ। তাতে কয়টি কথা লেখা। সকলে লেখাটার দিকে ঝুঁকে পড়ল।

সর্দার তাড়াতাড়ি কাগজটা সকলের চোখের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে নিল, কি দেখছিস সব হাঁ করে? যা ভাগ্।

বলে সর্দার কাগজটা ভাঁজ করে ট্যাঁকে গুঁজে রাখল।

তারপর কিছুক্ষণ ধরে সকলে মিলে কি সব পরমার্শ করল। রাত্রি যখন দেড়টা তখন সকলে একে একে বিদায় নিল। শুধু সর্দার গেল না। শরীরটা আজ তার বড় ক্লান্ত। সারা সকাল দুপুর যা দৌড় ঝাঁপ গেছে।

সর্দার দরজাটায় খিল তুলে দিয়ে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ল।

রাত্রি তখন অনেক গভীর। বিশ্ব চরাচর নিস্তব্ধ নিঝুম।

দরজায় গায়ে শব্দ শোনা গেল, টক্‌টক্।

সর্দারের ঘুমটা ভেঙে গেল, কে? সর্দার গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলে।

উত্তর এল চাপা গলায়, সর্দার, সোনা।

সর্দার উঠে দরজাটা খুলে দিল, এতরাত্রে কি খবর?

সোনা টল্‌তে টল্‌তে মাটির উপর শুয়ে পড়ল।

বড্ড ঘুম পেয়েছে সর্দার, পথেই ছিলাম, বাড়ি যাইনি। বড্ড সর্দি লেগেছে। কোন মতে কথাটা জড়িয়ে বলে সোনা চুপ করলে।

সর্দার ও আর বাক্য ব্যয় না করে আবার শুয়ে পড়ল এবং দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে নাক ডাকতে শুরু করে দিল।

তেইশ

রাতের অভিসার

শ্রীপুরেই একটা বাড়িতে দিন কয়েক হলো কিরীটী ও সুব্রত আশ্রয় নিয়েছিল।

সেই বাড়ির একটি ঘরে রাত তখন প্রায় এগারটা।

হঠাৎ কিরীটী উঠে পড়ে শয্যা থেকে।

সুব্রত শুধায়, উঠলি যে?

তৈরি হয়ে নে তুইও—

তৈরি হয়ে নেবো!

কিরীটী একটা কালো প্যান্টের উপর কালো সাটীনের সার্ট চাপাচ্ছিল।

সুব্রতর দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল, হ্যাঁ, এখুনি চৌধুরী বাড়িতে যেতে হবে।

এই এত রাতে?

উপায় নেই—রাঘব বোয়াল টোপ গিলেছে। দেখবি চল। ডাঙ্গায় কেমন তুলি খেলিয়ে খেলিয়ে।

হেঁয়ালী রেখে কথাটা ভেঙ্গেই বল না।

আজকের রাতটা কাটুক, শুভক্ষণ আসতে দে—

অল্পক্ষণের মধ্যেই কিরীটী আর সুব্রত বেরিয়ে পড়ল, প্রস্তুত হয়ে। কিরীটীর কোমরে ঝোলান টর্চ। আর, পকেটে একটা সিল্ক কর্ড।

গভীর রাত্রি। কালো বাদুরের ডানার মত যেন নিঃশব্দে ছড়িয়ে আছে।

মাঝে মাঝে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে রাতের মন্থর হাওয়া সিপ সিপ করে বয়ে যায়। মনে হয়, বুঝি রাতের অন্ধকারে কারা সব গা ঢাকা দিয়ে অশরীরী নিঃশ্বাস ফেলে ফেলে বেড়ায়।

কিরীটী আর সুব্রত শ্রীপুরের জমিদার বাড়ির বাগানে বড় একটা বকুল গাছের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

কিরীটী সুব্রতর গায়ে মৃদু একটা ঠেলা দিল, কটা বেজেছে? সুব্রত রেডিয়াম দেওয়া হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ঘড়িটা কিরীটীর চোখের সামনে উঁচু করে ধরল।

রাত্রি একটা বেজে পঁচিশ মিনিট। আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী।

কিন্তু এক একটা মিনিট যেন আর কাটতে চায় না।

প্রকাণ্ড জমিদার বাড়িটা যেন নিঃশব্দে ভূতের মত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে।

এমন সময় সহসা একটা সবুজ আলো অন্ধকারের বুকে জেগে উঠল। জমিদার বাড়ির দোতলায়—একটা জানালা পথে।

আর দেরী নয়। ফিস্ ফিস্ করে কিরীটী বলে।

কিরীটী সুব্রতর হাতে এক চাপ দিয়ে এগিয়ে চলল।

সুব্রতও তাকে অনুসরণ করল।

ওরা এসে পশ্চাতে অন্দর মহলের দরজার সামনে দাঁড়াল।

অন্দর মহলের সিঁড়ির দরজাটা খোলাই ছিল সেটা একটু ঈষৎ ঠেলা দিতেই খুলে গেল। কিরীটী আর সুব্রত ভিতরে ঢুকে বারান্দা অতিক্রম করে সামনেই উপরে উঠবার সিঁড়ি দেখতে পেল।

সিঁড়ির আলোটা টিম টিম করে জ্বলছে। সমস্ত সিঁড়িটায় একটা যেন আলো-আঁধারীর সৃষ্টি হয়েছে।

পা টিপে টিপে নিঃশব্দে কিরীটী সিঁড়ে বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

সামনে একটা টানা বারান্দা—দোতলায়—একতলার মতই জমাট আঁধার, কিছুই দেখবার উপায় নেই।

কিরীটী পা টিপে টিপে এগিয়ে চলে।

বারান্দা যেখানে বেঁকেছে তারই সামনে যে ঘর, সেইটাতেই পানু শোয়।

মৃদু একটা ঠেলা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। ওরা ঘরে পা দেয়।

ঘরের বাগানের দিককার জানালাটা খোলা।

রাতের হাওয়ায় খাটের উপর টাঙানো নেটের মশারিটা দুলে দুলে উঠছে আবছা আবছা অন্ধকারেও দেখা যায়।

কিরীটী এগিয়ে এসে নিঃশব্দে মশারিটা তুলে হস্তধৃত টর্চের বোতামটা টিপতেই বিছানাটার উপর টর্চের আলো গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

সুব্রত সভয়ে দেখলে, একটা বাঁকানো তীক্ষ্ণ ভোজালী পাশ বালিশটার গায়ে অর্দ্ধেকটার বেশী ঢুকে রয়েছে, শয্যা খালি।

কিরীটী হাসতে হাসতে বালিশের গা থেকে ভোজালীটা টেনে তুলে নিল।

ভোজালীটার হাতলটা হাতীর দাঁতের নানা কারুকার্য খচিত এবং সেই হাতলের গায়ে মীনা করে লেখা 'S.C'.

এমন সময় খুট করে একটা শব্দ শোনা যেতেই টুক করে কিরীটী হাতের টর্চটা নিভিয়ে দিল।

নিমিষে নিকষ কালো আঁধারে ঘর গেল ভরে।

পর মুহূর্তেই মনে হলো আশে পাশেই কোথাও কোন দরজা খুলে কে বুঝি নিঃশব্দে চোরের মত চুপি চুপি ঘরে ঢুকছে।

ওরা উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

সহসা এমন সময় আবার কিরীটীর হাতের টর্চ জ্বলে উঠলো।

সেই আলোয় সুব্রত ও কিরীটী দেখলে তাদেরই সামনে অল্প দূরে দাঁড়িয়ে শ্রীপুরের জমিদার স্বয়ং শশাঙ্কমোহন চৌধুরী।

তাঁর দুই চোখ দিয়ে বিহ্বল ও আতঙ্কপূর্ণ চাউনি যেন ফুটে বের হচ্ছে।

চব্বিশ

ধাঁধার উত্তর

কিরীটীর ডাকে সুব্রতর ঘুমটা ভেঙ্গে গেল—ওঠ হে সুব্রত রায়। জাগো, আঁখি মেল।

ওঠ বন্ধু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।

গরম চায়েতে মন করহ নিবেশ।

সুব্রত চোখ মেলে দেখলে কিরীটীর হাতে এক কাপ ধূমায়িত গরম চা, মাঝে মাঝে সে আরাম করে চুমুক দিচ্ছে।

সুব্রত তাড়াতাড়ি সলজ্জ একটু হেসে শয্যা ছেড়ে উঠে বসল।

একটু পরে দুই বন্ধু তখন বাইরের ঘরে বসে গত রাত্রির ঘটনার আলোচনা করছে। সিঁড়িতে জুতার শব্দ শোনা গেল।

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, শ্রীধর ওরফে আমাদের রাজু আসছেন—

সত্যি সত্যিই রাজু এসে ঘরে প্রবেশ করল।

উৎকণ্ঠায় সে যেন হাঁপাচ্ছে। ঘরে ঢুকেই একটা চেয়ারের উপর ধপ করে বসে পড়ে বলে। তারপর? এখন সব বল।

কি ধাঁধার উত্তর তো?

হ্যাঁ।

এই নে। কিরীটী একটুকরো ভাঁজ করা কাগজ রাজুর সামনে এগিয়ে ধরল। অধীর আগ্রহে ভাঁজ করা কাগজটা রাজু খুলে ফেলল।

১ নম্বর —বোতামঃ--ম +

২ নম্বর—ছয় বৎসরঃ —শ +

৩ নম্বর —চিঠি ও ফটো ঃ শ + ম

৪ নম্বর- চিঠি ঃ —শ—ম +

৫ নম্বর—কাটা আঙ্গুল ঃ—ম + +

৬ নম্বর—পোড়া সিগারেট ঃ--ম + +

(ক) করালী চরণঃ { শ +
ম + +

(খ) ছেলে চুরিঃ { শ +
ম + +
?

খানিকক্ষণ কাগজটার উপর চোখ বুলিয়ে রাজু বিস্মিতভাবে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, এ আবার কী?

ঐ তো তোমার আগাগোড়া সমস্ত রহস্যের মীমাংসা।

ধাঁধাঁর উত্তর।

বুঝিয়ে দে।

তবে বলি শোন, কিরীটী সিগারেটের টিন থেকে একটা সিগারেট নিয়ে তাতে অগ্নি সংযোগ করতে করতে বলতে শুরু করল।

শশাঙ্কমোহনের খুড়তুত ভাই হচ্ছে মৃগাঙ্কমোহন। আমরা উইলের ব্যাপারে জানি যে শশাঙ্কমোহনের বাপ যে উইল করে যান তার অর্থ এই, শশাঙ্কমোহনের যদি ছেলে হয় তবে সে সম্পত্তি পাবে আর যদি মেয়ে হয় তবে অর্ধেক পাবে সেই মেয়ে আর বাকী অর্ধেক পাবে মৃগাঙ্গমোহন নিজে কিম্বা তার ওয়ারিশগণ। মৃগাঙ্গমোহন যেদিন জানতে পারলেন যে দাদার সন্তান হবে তিনি মনে মনে এক অভিসন্ধি করলেন, যদি ছেলে হয় তবে সে ছেলেকে হত্যা করে অন্য একটি মেয়েকে সেখানে বদলে রাখতে হবে আর যদি মেয়ে হয় তবে তো কোন কথাই নেই। সব ল্যাটা চুকে যায়। করালীচরণ ছিল চৌধুরী বাড়ির পুরাতন চাকর। সে একদিন সহসা সন্ধ্যার অন্ধকারে মৃগাঙ্গমোহনের ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মৃগাঙ্কমোহনকে একজন লোকের সঙ্গে চুপিচুপি পরামর্শ করতে শোনে এবং সব কথাই তার কানে যায়।

মৃগাঙ্কমোহনের সঙ্গে ইতিপূর্বে আরো দু'একবার সেই লোকটি এসে পরামর্শ করেছে। তাও করালীচরণের নজর এড়ায়নি। করালী কোন দিন মৃগাঙ্কমোহনকে দু'চোখে দেখতে পারত না। মৃগাঙ্ক যে সে কথা জানত না তা নয়। পুরানো চাকর হিসেবে চৌধুরী বাড়ির উপরে করালীর বেশ একটু আধিপত্যই ছিল। শশাঙ্ককে ঐ করালীই কোলে পিঠে করে একপ্রকার মানুষ করেছিল। সেইজন্যই মৃগাঙ্ক করালীর প্রতি সন্তুষ্ট না থাকলেও কিছু বলতে সাহস করত না।

এই পর্যন্ত বেশ সোজা—সরল একটি ষড়যন্ত্র। তারপরেই ব্যাপারটা জটিল হয়ে গেল।

কি রকম? সুব্রত প্রশ্ন করে।

সেই কথাই এবারে বলব, কিরীটী বলতে লাগল।

স্থানীয় লেডী ডাক্তার ডাঃ মিস্ মল্লিকা সরখেলের সঙ্গে মৃগাঙ্কমোহনের রীতিমত একটা হৃদ্যতা ছিল, মল্লিকা মৃগাঙ্গকে বিয়ের জন্য তাকে বহুবার বলেছে কিন্তু মৃগাঙ্ক কান দেয় নি। অবশেষে মৃগাঙ্ক বললে—বিভাবতী তার বৌদি, সন্তান সম্ভাবিতা, ছেলে হবার সময় সুনিশ্চিত তার ডাক পড়বে। সেই

সময় যদি একটি পুত্র সন্তান হয়—এবং মল্লিকা সদ্যজাত সেই শিশুটিকে কোন মতে হত্যা করে সরিয়ে দিতে পারে তাহলে তাদের পথ পরিষ্কার। তাদের বিয়ে হতে পারে।

বলিস কি?

তাই, তবে মল্লিকা তখনো জানতে পারেনি মৃগাঙ্ক লোকটা কতবড় শয়তান!

তা একথা জানলি কি করে তুই?

মল্লিকাই জানায়!

মল্লিকা!

হ্যাঁ—একটা চিঠি দিয়েছিলাম তাকে—।

তারপর।

সে এখন শিলংয়ে ডাক্তারী করে। যাই হোক তারপর শোন—মৃগাঙ্কমোহন ডাঃ মল্লিকার সঙ্গে পরামর্শ করলেন ছেলে হলে মেরে ফেলতে হবে আর অন্যদিকে করালী দাইয়ের সঙ্গে গোপন পরামর্শ করে স্থির করে মৃগাঙ্কের দৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্য সে দাইয়ের সাহায্যে সেই নবজাত শিশুটিকে আঁতুড় ঘর থেকে সরিয়ে ফেলবে—হত্যা করতে কিছুতেই দেবে না যদি শশাঙ্কমোহনের ছেলে হয়, আর মেয়ে হলে তো ল্যাটাই নেই কোন।

তারপর?

এদিকে মৃগাঙ্কমোহনের প্রস্তাবে সম্মত হলেও ডাঃ মল্লিকা হাজাব হলেও স্ত্রী-লোক মায়ের জাত—মনে মনে সে স্থির করে যদি ছেলেই হয় তো হত্যা করবে না, তাকে সরিয়ে ফেলবে—আর তাকে সাহায্য করবার জন্য দাইকে বলবে। দাই—মঙ্গলার ঐ কথা শুনে তো ভালই হলো। করালীর সঙ্গে যে পরামর্শ হয়েছে সে কথা তাকে সে তখন বললে।

হাতের সিগ্রেটটা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। একটা নতুন সিগ্রেটে অগ্নি সংযোগ করে আবার কিরীটী তার অর্ধসমাপ্ত কাহিনী শুরু করে।

যথা সময়ে সন্তান হলো—দাই মঙ্গলা ডাঃ মল্লিকার সঙ্গে পরামর্শ করে পূর্বাহ্ণেই স্থির করে রেখেছিল ছেলে হলে সরিয়ে ফেলবে। কিন্তু ভগবানই হলেন ওদের সহায়—মেয়ে ও ছেলে দুই হলো।

তার মানে?

শ্রীলেখা, পানুর যমজ বোন।

সে কি!

হ্যাঁ—আগে পানু পরে শ্রীলেখা জন্মায়। পানুর জন্মের প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে শ্রীলেখা জন্মায়। মৃগাঙ্গকে ডাঃ মল্লিকা জানাল শশাঙ্কর মেয়ে

হয়েছে আর ছেলেটিকে সে সরিয়ে দিল দাইয়ের সাহায্যে মঙ্গলারই ঘরে।

মঙ্গলার ঘরে।

হ্যাঁ, মঙ্গলার কোন সন্তানাদি ছিল না। সেই পানুকে বুকে তুলে নিল এবং মঙ্গলার বুকের মধ্যে পানু বড় হতে লাগল করালী ও মঙ্গলার তত্ত্বাবধানে—

তারপর—

কিন্তু করালী বেশী দিন পানুকে মঙ্গলার কাছে রাখতে সাহস পায় না—সে তখন সরিয়ে দেয় পানু অর্থাৎ সুধীরকে হরমোহিনী আশ্রমে ডাঃ মল্লিকারই সাহায্যে। এবং সেখানে দিয়ে আসবার সময় করালী বুদ্ধি করে একটা কবচের মধ্যে ওর সত্যিকারের নাম ও পরিচয়টা লিখে হাতে বেঁধে দেয়। ঐ ঘটনার কিছুদিন পরেই মঙ্গলার মৃত্যু হয়। করালীচরণ মধ্যে মধ্যে যেত হরমোনিহী আশ্রমে এবং সুধীরের খোঁজ খবর নিয়ে আসত—। পানু বা সুধীর বড় হতে লাগল অনাথ আশ্রমে আর শ্রীলেখা মা-বাবার কাছে। এমনি করেই চলছিল—তারপরই আকাশে দেখা দিল দুর্যোগের কালো মেঘ।

কি রকম? সুব্রত শুধায়।

কিরীটী আবার বলতে শুরু করে ঃ ডাঃ মল্লিকা তারই ঠিকানা দিয়ে অনাথ বলে করালীর সাহায্যে পানুকে নিয়ে গিয়ে আশ্রমে ভর্তি করে দিয়েছিল আগেই বলেছি। হঠাৎ একদিন সুধীর আশ্রম থেকে অদৃশ্য হলো—সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের সুপারিনটেনডেণ্ট চিঠি দিয়ে মল্লিকাকে কথাটা জানাল। ইতিমধ্যে মল্লিকার সঙ্গে মৃগাঙ্কর সমস্ত সম্পর্ক ছেদ হয়ে গিয়েছিল। মল্লিকা শিলংয়ে চলে গিয়েছিল সেও বলেছি। ডাঃ মল্লিকা সংবাদটা পেয়ে ভয় পেলে গেল এবং শ্রীপুরে সবকথা জানিয়ে করালীকে চিঠি দেয়।

চিঠি?

হ্যাঁ—সেই চিঠি দুর্ভাগ্যক্রমে পড়ল গিয়ে মৃগাঙ্কর হাতে সম্ভবতঃ ছয়বছর পরে অকস্মাৎ একদিন আর এই প্রথম মৃগাঙ্কের মনে সন্দেহ জন্মায় ঐ চিঠি পড়ে।

মৃগাঙ্ক করালীকে চেপে ধরে।

প্রথম লোভ দেখায়—তারপর ভয়—কিন্তু কিছুতেই মৃগাঙ্ক করালীকে যখন বাগে আনতে পারল না—সেই সময় শেষ চেষ্টা করার জন্য মৃগাঙ্ক এক রাত্রে করালীর ঘরে গিয়ে হাজির হলো।

মৃগাঙ্কর গায়ে ঐ সময় একটা কালো রঙের ওভারকোট ছিল—পাছে তাকে কেউ না দেখে হঠাৎ চিনে ফেলে।

তারপর আমার অনুমান দুজনার মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় ও উত্তেজনার মুহূর্তে হয়ত ভোজালি দিয়ে করালীচরণকে আঘাত করে মৃগাঙ্কমোহন। এবং

সম্ভবতঃ আঘাত খেয়ে পড়বার সময় করালী মৃগাঙ্ককে জাপটে ধরতে যায় বা কিছু, মৃগাঙ্কর জামার একটা বোতাম ছিঁড়ে করালীর মুঠির মধ্যে থেকে যায়।

করালীকে ঐ ভাবে নিষ্ঠুরের মত হত্যা করবার ইচ্ছা মৃগাঙ্কমোহনের ছিল কি ছিল না কে জানে, তবে করালীচরণ নিহত হলো মৃগাঙ্কমোহনের হাতেই, মৃত্যু ছিল বোধহয় তার মৃগাঙ্কমোহনের হাতেই। কিন্তু করালীর মৃত্যুতে মৃগাঙ্কমোহন ভয় পেয়ে গেল। এবং ভয় পেয়ে ব্যাপারটা হত্যা নয় আত্মহত্যা বলে চালাবার চেষ্টা করল। সেই কারণেই মৃতের হাতে ভোজালীটা গুঁজে দেয় এবং বারবার বলতে থাকে ব্যাপারটা হত্যা নয় আত্মহত্যা।

সুব্রত প্রশ্ন করে, মৃগাঙ্কমোহনকে কি তুই আগেই সন্দেহ করেছিলি?

হ্যাঁ—তবে প্রথমটায় নয়—কিছুদিন তদন্ত চালাবার পর —ওর প্রতি সন্দেহটা বদ্ধমূল হয়।

কেন—

চারটি কারণে তার উপরে আমার সন্দেহ জাগে। (১) করালীর হাতের মুঠিতে বোতাম—ঐ বোতামটার ব্যাপারে আমি রাজুকে অনুসন্ধান করতে বলি—বোতামটা ওকে দিয়ে। (২) রাজু খুঁজতে খুঁজতে মৃগাঙ্কমোহনের জামাটা আবিষ্কার করে,—মৃগাঙ্কমোহনেরই ঘরে একটা বইয়ের আলমারীর মধ্যে দলামোচড়া অবস্থায়। নিশ্চয়ই বইয়ের আলমারী জামা রাখার, বিশেষ করে অত দামী গরম কোট একটা রাখবার জায়গা নয়, সেটাও যেমন একটা সন্দেহের কারণ তেমনি বোতামটাও অবিশ্যি প্রথমে আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছিল—দামী সৌখীন বোতাম সচরাচর বড় একটা চোখে পড়ে না। (৩) মৃগাঙ্কমোহনের করালীর মৃত্যুটা আত্মহত্যা প্রমাণ করবার বিশ্রী চেষ্টাটা। (৪) মৃগাঙ্কর চিঠির ভাঙ্গা ‘S’ ও ‘b’ টাইপ দুটো।

তারপর?

এরপরে সুধীরের ইতিহাসে আসা যাক। সুধীর বা পানুর বাপ শশাঙ্কমোহন জানতেন না দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার ছেলের ব্যাপারটা। প্রথম জানতে পারলেন পাঁচবছর আগে সুধীর অকস্মাৎ ‘হরমোহিনী আশ্রম’ থেকে নিরুদ্দিষ্ট হবার পর। এবং জানতে পারেন তিনি ডাঃ মল্লিকার চিঠিতে। ডাঃ মল্লিকাই একটা চিঠিতে সব কথা—এমন কি কবচের কথাটাও জানায় ও একটা গ্রুপ ফটো ওদের পাঠিয়ে দেয়। বলাই বাহুল্য শশাঙ্কমোহন এবার রীতিমতো বিচলিত হলেন এবং নিরুদ্দিষ্ট ছেলের সন্ধান করতে লাগলেন গোপনে গোপনে। পাছে মৃগাঙ্ক ব্যাপারটা জেনে ফেলে এই ভয়ে গোপনে অনুসন্ধান করতে লাগলেন—এমনি করে ছয়টা বছর আরো কেটে গেল—তারপর অকস্মাৎ

একদিন দৈবক্রমে মল্লিকার চিঠিটা মৃগাঙ্কর হাতে পড়ল। মৃগাঙ্ক এই প্রথম আসল ব্যাপারটা জানতে পারেন—সে করালীকে চেপে ধরল—যার ফলে করালী ঘটনাচক্রে হলো মৃগাঙ্কর হাতে নিহত।

অতঃপর আমাদের অকুস্থানে আবির্ভাব। করালীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে শশাঙ্কমোহন ফিরে এলেন শ্রীপুরে... বুঝলেন মৃগাঙ্ক সব জেনে ফেলেছে। অতএব কি করবেন স্থির করতে না পেরে—একেবারে বোবা হয়ে গেলেন যেন।

কিন্তু মৃগাঙ্কমোহন তখন মরিয়া—সে চিঠি দিল আমাকে ইংরাজীতে টাইপ করে—মৃগাঙ্ক তার নিজের টাইপ রাইটিং মেসিনে টাইপ করে চিঠি দেয়—যে মেশিনের দুটো অক্ষর বড় হাতের 'S' ছোট হাতের 'b' টা ছিল ভাঙ্গা—মৃগাঙ্কমোহনের বিরুদ্ধে মোক্ষম ও সর্বশেষ প্রমাণ। মৃগাঙ্ক বুঝেছিল অন্য কেউ না পারলেও আমরা হয়ত সুধীরের সন্ধান করতে পারব। আমার ক্ষমতা সম্পর্কে তার এতটুকুও সন্দেহ ছিল না—আর সেই কারণেই সে আমাকে করালীর হত্যার ব্যাপারেও অনুসন্ধান করবার জন্য ডেকে নিয়েছিল। অর্থাৎ আমাকে ডাকা ও পরে চিঠি দেওয়া দুটোর মূলেই ছিল সুধীরের অনুসন্ধান পাওয়া।

কিন্তু কি করে তুই নিঃসন্দেহ হয়েছিলি যে মৃগাঙ্কই চিঠি দিয়েছে তোকে?

বললাম তো—কিরীটী বলতে থাকে, হত্যানুসন্ধানের ব্যাপারে মৃগাঙ্ক মোহনের অত্যধিক আগ্রহ দেখে—তাছাড়া ঐ চিঠির মধ্যে উইলের কথা ছিল সেটাও মনে আমার সন্দেহের উদ্রেক করে। অতঃপর বুঝতে পারি ঐ ছেলে চুরি, উইল ও সর্বশেষ করালীচরণের হত্যা—সব এক সূত্রে গাঁথা। একটি অখণ্ড মালা। তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্য ধূর্জটীর ছদ্মবেশে শশাঙ্কমোহনের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম শ্রীপুর এবং শশাঙ্কমোহনের সঙ্গে কথার ভাবেই আমি বুঝলাম যে, মৃগাঙ্কমোহনই আমায় চিঠি দিয়েছে। কেননা ষড়যন্ত্রকারী একজনের নাম জানতে গিয়ে আমি মৃগাঙ্কর নাম একটা স্লিপে লিখে ওঁকে দেখিয়েছিলাম। সেই নাম দেখে শশাঙ্কমোহনের মুখের ভাব একেবারে বদলে গেল।

এদিকে আমি চলে আসবার পর রাজু শশাঙ্কমোহনের দরজায় আমার ইসারা মত 'কি হোল্' দেখতে গিয়ে শশাঙ্কমোহনের আলমারী তন্নতন্ন করে খোঁজা ও মুখের একটা অস্ফুট কথা শুনতে পায়। সেটা হচ্ছে, আশ্চর্য। চিঠির এই advertisement (বিজ্ঞাপন) ব্যাপার নিয়ে যে নানা রকম গোলমাল বাঁধতে পারে তা আমি জানতাম। পরিচয়ের আসল নিদর্শন কবচটি ও তার মধ্যেকার পরিচয় লিপি জোগাড় করা সম্ভব হবে না। হলও তাই। যে একজন

ঠকাতে এল সে ঐখানেই ঠকে গেল। আমি প্রথম থেকেই প্রথম সুধীর 'জাল' জেনেও কোন উচ্চবাচ্য করিনি—তার কারণ মৃগাঙ্কর মনে সুধীরকে পাওয়ায় কী পরিবর্তন দেখা দেয় সেটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য।

তারপর যা যা ঘটে এবং শ্রীরামপুর থেকে আসল সুধীরকে কেমন করে পাওয়া যায় তাতো তোমরা জানই।

সুধীর ফিরে এলে মৃগাঙ্কমোহন যে ক্ষেপে উঠবে তা আমি আগে থেকেই জানতাম এবং এও জানতাম এবারে সে মরিয়া হয়েই হয়ত শেষ চেষ্টা একবার করে দেখবে। তাই রাজুকে বললাম, মৃগাঙ্কর উপর কড়া পাহারা দিতে।

মৃগাঙ্ক নকল ও আসল সুধীরের গোলমালে পড়ে প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গেল। কিন্তু মীমাংসার সমাধান যখন হয়ে গেল, সে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে এল।

একদিন হঠাৎ এক খোঁড়া ভিখারী জমিদার বাড়িতে ভিক্ষা করতে এল।

মৃগাঙ্কমোহন দয়া পরবশ হয়ে একটা গোটা কাপড় ভিক্ষুককে দান করে বসলেন, যার হাত দিয়ে ইতিপূর্বে কখনও একটা আধলাও গলেনি।

রাজুর মনে কেমন একটু সন্দেহ হওয়ায় সে ভিক্ষুককে অনুসরণ করল। ভিক্ষুক বরাবর স্টীমার ঘাটে এসে টিকিট কিনে স্টীমার চেপে বসল।

রাজুও কাল বিলম্ব না করে স্টীমারে গিয়ে চাপল?

এই পর্যন্ত বলে কিরীটী থামল। বললে ঃ এখন এই পর্যন্ত। বাকী দুপুরে বলব।

পঁচিশ

বিশ্লেষণের শেষ

দুপুরের দিকে খাওয়া দাওয়ার পর সকলে এসে কিরীটীর ড্রইং রুমে একত্রিত হলো।

একটা সিগারেট ধরিয়ে কিরীটী বলতে লাগল ঃ

হ্যাঁ, তারপর রাজু ভিক্ষুককে অনুসরণ করে বরাবর এসে পাথুরেঘাটার এক আড্ডায় উঠলো। পথিমধ্যে ভিক্ষুক এক জায়গায় সেই কাপড়ের খুঁট থেকে খানিকটা কাপড় ছিঁড়ে জামার নীচে গুঁজে রেখেছিল। তাতে রাজুর সন্দেহ আরো ঘনীভূত হয়।

পাথুরেঘাটার আড্ডায় দরজার আড়াল থেকে সবই রাজু কান পেতে শুনল। এবং শুনে মনে মনে এক মতলব এঁটে দাঁড়িয়ে রইল।

লোকগুলি যখন বের হলো, সে কথাবার্তায় সহজেই দলের মধ্যে সোনাকে চিনে নিল। তারপর বরাবর নিজের পুরানো আড্ডায় গিয়ে অনেকটা সোনার মতই দেখতে একজনকে সোনা সাজিয়ে এনে গভীর রাত্রে সর্দারের ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত সর্দারের ট্যাঁক থেকে কাগজটা চুরি করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিল।

চিঠি—

হ্যাঁ, সেই চিঠি পেয়েই তো আমার মুখ সেইদিন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু চিঠিতে কি ছিল—

ছিল দুটো কথা। প্রথমতঃ—ষড়যন্ত্র টের পাওয়া গেল এবং দ্বিতীয় মৃগাঙ্কমোহনই যে দোষী, তাও একেবারে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল হাতে লেখা দেখে সেই চিঠি থেকেই। এই সেই চিঠি, দেখ।

বলতে বলতে কিরীটী একটা ভাঁজকরা কাগজ টেনে বের করল। কাগজটায় পেন্সিল দিয়ে লেখা ঃ শুক্রবার রাত্রি দেড়টায় সবুজ আলোর নিশানা পাবে।

এই চিঠির হাতের লেখা থেকে আরো একটা জিনিস বুঝলাম ; লক্ষ্য করে দেখ, তোমরাও হয়ত বুঝতে পারবে,লেখাগুলি কাগজের উপর একটু যেন জোরে জোরে বসেছে...অনেক জায়গায় দু'পিঠ কাগজের গা ফুটো হয়ে গেছে।

এর থেকে বুঝতে পারা যায়, যে চিঠি লিখেছে সে কোন কারণে জোরে চাপ দিয়ে লেখে।...তোমরা লক্ষ্য করেছো কিনা জানিনা মৃগাঙ্কর ডান হাতের প্রথম আঙ্গুলটা নেই। ভেবে দেখ পেন্সিল তাহলে দ্বিতীয় আঙ্গুলের উপর

চেপে লিখতে হবে, যদি লিখতে হয়। তা'হলে চিঠিটা যে মৃগাঙ্কর হাতের লেখা সে বিষয়েও কোন সন্দেহ আর থাকে না।

অবিশ্যি আমি বুঝেছিলাম এ সুযোগ মৃগাঙ্ক ভালভাবেই নেবে। তাই আমি আগে থাকতেই রাজুর সাহায্যে পানুকে অন্য ঘরে শুতে বলি শুক্রবার রাত্রে এবং তার বিছানা পেতে বালিশ দিয়ে মশারি ফেলে রাখতে বলি। আততায়ীরা এসে আলোর নিশানা পেয়ে আঁধারে পানু ভেবে বালিশের উপরেই ছোরা বসিয়ে চলে যায়।

কিন্তু শশাঙ্কমোহনকে সে ঘরে আমরা দেখলাম কেন?

শশাঙ্কমোহনের মনেও হয়ত সন্দেহ হয়েছিল। শশাঙ্কমোহন গুপ্ত দ্বারপথে ছেলের খবর নিতে এসে আমাদের কাছে ধরা পড়ে গেলেন। পরদিন আমার অনুরোধে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার খুলে বললেন। ওভার কোটের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, বোতামটা তারই একটা ওভার কোটের। মৃগাঙ্ক দাদার কোট গায়ে দিয়ে মুখোশ এঁটে করালীর সঙ্গে দেখা করতে যায়, এই ভেবে, যদি ধরাই পড়ে তবে কেউ তাকে চিনতে পারবে না। আর কোটটা থেকে যদি কোন কিছু ধরা পড়ে তবে সেটাও দাদার ঘাড়েই পড়বে। আমরা যখন ছাদে গেলাম সেই রাত্রে মৃগাঙ্ক তার আগেই গা ঢাকা দিয়েছিল।

কিন্তু টর্চের আলোয় একগাদা পোড়া ক্যাপসটেন সিগারেটের টুকরো ছাদে পাওয়া গেল।

মৃগাঙ্ক যে ভীষণ সিগারেট খায়, তা আমি প্রথম দিনই মৃগাঙ্কর হাতে নিকোটিনের দাগ দেখেই বুঝেছিলাম।

এখন সব মিলিয়ে দেখ। ধাঁধাঁর উত্তর মিলে কি না?

১নং বোতাম ঃ ম + অর্থাৎ 'ম' র মৃগাঙ্কর পরে সন্দেহ জাগে।

২ নং ছয় বৎসর ঃ — শ + ছয় বৎসরের আগেকার ব্যাপারও শশাঙ্ক জানত কিন্তু মৃগাঙ্ক জানত না।

৩নং চিঠি ও কাটো ঃ — শ + যার দ্বারা মৃগাঙ্ক সব জানতে পারে।

৪নং চিঠি ঃ — শ + শশাঙ্কর নয় মৃগাঙ্করই লেখা।

৫নং কাটা আঙ্গুল ঃ — ম + যার জন্য প্রমাণ চিঠি। মৃগাঙ্করই হাতের লেখা।

৬নং পোড়া সিগারেট ঃ — ম + মৃগাঙ্করই হাতে নিকোটিনের দাগ ছিল।

অতএব বোঝা যাচ্ছে করালীকে হত্যা করে মৃগাঙ্কই।

ছেলে চুরি করে শশাঙ্ক, মৃগাঙ্ক নয়। করালী ডাঃ মল্লিকার সহায়তায়।

যাক্, শ্রীপুর রহস্যের সমাধান হয়েছে তো।

ক্রিং, ক্রিং টেলিফোন বেজে উঠল, কিরীটী ফোন ধরল, হ্যালো।

হ্যাঁ, আমি কিরীটী। কী বল্লেন, নিমন্ত্রণ? বেশ, বেশ, যাবো নিশ্চয়ই যাবো।

ফোনটা নামিয়ে রেখে কিরীটী ওদের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে, ওহে আজ রাত্রে শ্রীপুরে সকলের নিমন্ত্রণ।

সুব্রত চেঁচিয়ে উঠল—হিপ হিপ হুররে।

হতভাগ্য মৃগাঙ্কমোহন—শেষ পর্যন্ত বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল লজ্জায় অপমানে পরের দিনই রাত্রে।

পানু কিন্তু নতুন এই আবেষ্টনীতে হাঁপিয়ে উঠতে লাগল।

যে স্নেহ থেকে সে তার জীবনের প্রথম মুহূর্তেই বঞ্চিত হয়েছিল, আজ সেই স্নেহই যখন অপর্যাপ্তভাবে বন্যাস্রোতের মত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে —ও অন্তর থেকে তাকে কোন মতেই যেন গ্রহণ করতে পারে না।

'হরমোহিনী আশ্রমে' আসবার আগে যে স্নেহের আস্বাদ সে দু'চার বছরের জন্য পেয়েছিল সেটা তার মনে তেমন দাগ কাটতে পারেনি। কেননা সে বয়সে কোন একটা কিছুকে সহজভাবে একান্ত করে নেওয়া ও আবার একান্ত করে ভুলে যাওয়াটাই হচ্ছে ধর্ম এবং তারপর 'হরমোহিনী আশ্রমে' তার জীবনের যে ক'টা দিন কেটেছে সেটা সহজ স্ফূর্তির মধ্যে দিয়ে নয়—তাই একদিন রাত্রে অত্যন্ত দুঃসাহসিক ভাবেই সে আশ্রমের গেট ডিঙ্গিয়ে সে চলে এসেছিল—তাকে সে অতি সহজেই ভুলতে পেরেছিল।

তারপর এলো এক নতুন মা—পরমেশবাবুর মেয়ে রমা ওর জীবন পথে। পরিপূর্ণ স্নেহ ও ভালবাসা নিয়ে যেন মুহূর্তে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আপন করে নিয়েছিল রমা।

পানুর চিরশুষ্ক স্নেহ-ব্যাকুল সমগ্র অন্তর সে স্নেহের ধারায় গেল জুড়িয়ে।

সে নিঃস্ব হয়ে আপনার অতীত ও ভবিষ্যতকে ভুলে আপনাকে বর্তমানের মধ্যে বিলিয়ে দিল। আজ তাই এই ঐশ্বর্যের চাকচিক্যের মধ্যে এসেও সেই মা'র কথাই বার বার তার অন্তরকে কাঁদিয়ে ফিরতে লাগল।

মাঝে মাঝে শ্রীলেখা এসে জিজ্ঞাসা করে ঃ কী হয়েছে দাদা?

কে শ্রী? আয় বোস। পানু ওর দিকে ফিরে বলে, কই কিছু তো ভাবছি না?

দিনরাত ঘরের মধ্যে বসে থাক কেন দাদা? তার চাইতে চল বাগানে ঘুরে আসি। না হয় মোটরে করে খানিকটা ঘুরে আসি।—চল পানসীতে করে না হয় গঙ্গায় বেরিয়ে আসি।

যায় বটে শ্রীলেখার ডাকে বাইরে পানু কিন্তু মন তার যেন ভরে না। একটা শূন্যতা যেন মনের মধ্যে কেঁদে কেঁদে মরে। মধ্যে মধ্যে মনে পড়ে দাদা সুনীলের কথা।

সেই চির দুর্দান্ত ...পথহারা অফুরন্ত সুনীল। কে জানে এখন সে কোথায়?

বিভাবতী এসে বলেন ঃ এদিক ওদিক একটু ঘুরে আয় দুজনে। এমনি করে দিবারাত্র ঘরের মধ্যে বসে থাকলে যে অসুখ হয়ে যাবে।

দিনরাত পানু স্বপ্ন দেখে, শ্রীরামপুরের মা যেন দিবারাত্র তারই জন্য কাঁদছেন।

পানু ফিরে আয় বাবা, সুনু আমায় ছেড়ে চলে গেল, তুইও যাসনি।

ছাব্বিশ

শেষের কথা

পানুর ঘুম ভেঙে যায়। নিঃশব্দ নিঝুম জমিদার বাড়ি।

আঁধারে বাগানের গাছপালা গুলি রাতের চোরা হাওয়ায় যেন মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে ওঠে। ওই দূরে শুকতারা। একাকী বোবা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে জেগে থাকে, ঘুম আসছে না পানুর, শয্যার উপর উঠে বসল।

শয্যার উপরে বসে বসে কিছুক্ষণ যেন কি ভাবল।

সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে দেখলে, রাত্রি দেড়টা।

পানু শয্যা থেকে উঠে নীচে নেমে দাঁড়াল।

সেই রাত্রে নৌকা ভাড়া করে পানু জোয়ারের টানে শ্রীরামপুর এসে যখন পৌঁছাল তখন রাত্রি শেষ হতে আর দেরী নেই। পূব গগনে ঊষার অরুণ আলোর আভাস জেগেছে।

প্রাচীর টপকে পানু তাঁর পরিচিত গৃহে গিয়ে ঢুকল... মেঝের উপরে রমা উপুড় হয়ে ঘুমিয়ে।

পানু ধীর পদে গিয়ে তার মাথার কাছটিতে বসল।

মা? ও, মা। পানু তার হাতটি রমার মাথার উপরে রাখলে।

মাগো।

কে, ধড়ফর করে রমা উঠে বসে।

আমি পানু।—

পানু এসেছিস বাবা। দু'হাতে গভীর স্নেহে রমা পানুকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। দু'জনের চোখের কোল বেয়ে অশ্রুধারা নামে।

পানুর গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে গভীর স্নেহে রমা বলে, এত রোগা হয়ে গেছিস কেন বাবা?

পানু নীরবে মায়ের বুকে মুখ গুঁজে মাথাটা ঘষতে থাকে। তারপর কত কথা যে দু'জনে বলে—কখন একসময় পরমেশবাবু চৌকাঠের উপরে এসে দাঁড়িয়েছেন—কারুরই তা খেয়াল নেই।

একি পানু?

পানু চমকে চেয়ে দেখে ভোরের প্রথম আলোয় ঘরের অন্ধকার কখন দূর হয়ে গেছে। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে দাদু।

হ্যাঁ দাদু আমি। আমি আবার তোমাদের কাছেই চলে এলাম, মাকে ছেড়ে

থাকতে পারলাম না। বলতে বলতে সস্নেহে পানু দুহাতে রমার গলা জড়িয়ে ধরে।

পরমেশবাবুর চোখের কোল দুটি জলে ভরে উঠল।

সকালবেলাই পরমেশবাবু ডাকঘরে গিয়ে শশাঙ্কমোহনকে 'তার' করে দিলেন ঃ পানু আমার এখানে এসেছে, চিন্তার কোন কারণ নেই।

বেলা-বারোটায় 'তারের' জবাব এলো, নিশ্চিন্ত হলাম সে নিরাপদ জেনে, আর সুখী হলাম, সে স্নেহ ও ভালবাসাকে ভুলতে পারিনি জেনে, বিকেলের দিকেই আমরা যাচ্ছি। তারপর অন্যান্য ব্যবস্থা হবে।

শশাঙ্কমোহন।

পাশের ঘরে তখন রমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পানু তার জীবনের এ কয়টা দিনের বিচত্র অভিজ্ঞতার কাহিনীই বলছিল।

দুই

এক

নতুন ম্যানেজার

ডিসেম্বরের শেষের শীতের রাত্রি।

কুয়াশার ধূসর ওড়নার আড়ালে আকাশে যেটুকু চাঁদের আলো ছিল তাও যেন চাপা পড়ে গেছে।

মিনিট কয়েক হয় মাত্র এক্সেপ্রেস ট্রেনটা ছেড়ে চলে গেল?

গাড়ির পিছনকার লাল আলোটা এতক্ষণ যা দেখাচ্ছিল একটা রক্তের গোলার মত, এখন সেটাও কুয়াশার অস্বচ্ছতায় হারিয়ে গেছে।

স্টেশনের ইলেকট্রিক বাতিগুলো কুয়াশার আবরণ যেন ভেদ করে উঠতে পারছে না।

ধানবাদ স্টেশনের লাল কাঁকর-ঢালা চওড়া প্ল্যাট্‌ফরমটা জনশূন্য।

একটু আগে ট্রেনটা থামার জন্য যে সামান্য চঞ্চলতা জেগেছিল এখন তার লেশমাত্রও নেই।

একটা থমথম করা স্তব্ধতা চারিদিকে যেন।

জুতার মচ্ মচ্ শব্দ জাগিয়ে দুই জন ভদ্রলোক প্ল্যাট্‌ফরমের উপর দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে বেড়াচ্ছে।

একজন বেশ লম্বা বলিষ্ঠ চেহারার, পরিধানে কালো রংয়ের দামী সার্জের সুট্। তার উপর একটা লং কোট চাপান। মাথায় পশমের নাইট্ ক্যাপ্, কান পর্যন্ত ঢাকা।

অন্যজন অনেকটা খাটো। পরণে ধুতি, গায়ে মাথায় একটা শাল জড়ান। মুখে একটা জ্বলন্ত বিড়ি।

চা-ভেণ্ডার তার চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এগিয়ে এল, বাবু, গরম চা। গরম চা?...

না, প্রথম ব্যক্তি বললে।

গলার স্বরটা বেশ ভারী ও মোটা।

চা-ভেণ্ডার চলে গেল।

দ্বিতীয় ব্যক্তির দিকে ফিরে প্রথম ব্যক্তি প্রশ্ন করলে, সুশান্তবাবু যেন খুন হলেন কবে?

গত ২৮ শে জুন রাত্রে।

আজ পর্যন্ত তাহলে তাঁর মৃত্যুর কোন কারণই খুঁজে পান নি?

না, খুনীকে খুঁজতেও তো কসুর করলাম না। আমাদের কুলী গ্যাং, কর্মচারীরা, মায় পুলিস অফিসাররা পর্যন্ত খুঁজে খুঁজে সবাই হয়রাণ হয়ে গেছেন।

আশ্চর্য!

তা আশ্চর্য বৈকি! পর পর তিনজন ম্যানেজার এমনি করে কোয়ার্টারের মধ্যে খুন হলেন। আমরা তো ভেবেছিলাম, এরপর কেউ আর এখানে কাজ নিয়ে আসতেই চাইবেন না। হাজার হোক একটা প্যানিক (ভীতি) তো, বলে লোকটি ঘন ঘন প্রায়-শেষ বিড়িটায় টান দিতে লাগল।

শংকর সেন মৃদু হেসে বললেন, আমি লয়াবাদে একটা কোলিয়ারিতে মোটা মাইনের চাকরী করছিলাম। তাহলে কথাটা আপনাকে খুলেই বলি— ঐ যে ভয়ের কথা কি বললেন—আমাদের বড়বাবুর মুখে এখানকার ঐ ভয়ের ব্যাপারটা শুনে চার মাসের ছুটি নিয়ে এই চাকরীতে এসে জয়েন করেছি—।

কিন্তু—

ভয় নেই, পছন্দ হলে থেকে যাবো।

আপনার খুব সাহস আছে দেখছি শংকরবাবু!

শুধু আমিই নয়—শংকর সেন বলতে লাগলেন, আমার এক কলেজ ফ্রেণ্ডকেও লিখেছি আসতে। বর্তমানে সে সখের গোয়েন্দাগিরি করে। যেমন দুর্দান্ত সাহস, তেমন চুলচেরা বুদ্ধি। কেননা আমার ধারণা এইভাবে পরপর আপনাদের ম্যানেজার নিহত হওয়ার পিছনে ভৌতিক কিছু নেই, আছে কোন শয়তানের কারসাজী।

বলেন কি স্যার? আমার কিন্তু ধারণা এটা অন্য কিছু।

অন্য কিছু মানে? শংকর সেন বিমলবাবুর মুখের দিকে তাকাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

যে জমিটায় ওঁরা অর্থাৎ আমাদের কর্তারা কোলিয়ারী শুরু করতে ইচ্ছা করেছেন, ওটা একটা অভিশপ্ত জায়গা। ওখানকার আশে-পাশের গ্রামের সাঁওতালদের কাছে শুনেছি, ওই জায়াগাটায় নাকি বহুকাল আগে একটা ডাকাতের আড্ডাখানা ছিল, সেই সময় বহু লোক ওখানে খুন হয়েছে। সেই সব হতভাগ্যদের অদেহী অভিশপ্ত আত্মা আজও ওখানে দিবারাত্রি নাকি ঘুরে বেড়ায়।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, কতদিন রাত্রে বিশ্রী কান্না ও গোলমালের শব্দে আমারও ঘুম ভেঙে

গেছে। আবছা চাঁদের আলোয় মনে হয়েছে যেন হালকা আবছা কারা মাঠের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অল্‌ বোগাস্‌। দাঁতে দাঁত চেপে শংকর সেন বললে।

আমি জানি স্যার, ইংরাজি শিক্ষা পেয়ে আপনারা আজ এ সব হয়ত বিশ্বাস করতে চাইবেন না কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি। মরণই আমাদের শেষ নয়। মরণের ওপারে একটা জগত আছে এবং সে জগতের যারা বাসিন্দা তাদেরও প্রাণে ওই মাটির পৃথিবীর লোকেদের মতই দয়া, মায়া, ভালবাসা, আকাঙ্খা, হিংসা প্রভৃতি অনুভূতিগুলো আছে এবং মাটির পৃথিবী ছেড়ে গেলেও এখানকার মায়া সহজে তারা কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে না।

একটানা কথাগুলো বলে বিমলবাবু, একটা বিড়ি ধরিয়ে প্রাণপণে টানতে লাগলেন।

কই, আপনার বাসের আর কত দেরী?

এই তো আর মিনিট কুড়ি বাকী।

চলুন রেষ্টুরেণ্ট থেকে একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক।

আজ্ঞে চায়ে আমার নেশা নেই।

তাই নাকি? বেশ। বেশ। কিন্তু এই শীতে চা-বিনে থাকেন কি করে?

আজ্ঞে, গরীব মানুষ।

দু'জনে এসে কেল্‌নারের রেষ্টুরেণ্ট-এ' ঢুকল, এবং চায়ের অর্ডার দিয়ে দু'জনে দু'খানা চেয়ার দখল করে বসল।

আপনি আপনার যে বন্ধুটির কথা বলছিলেন তাঁর বুঝি গোয়েন্দাগিরিতে খুব হুজুগ আছে?

হ্যাঁ, হুজুগই বটে। শংকরবাবু হাসতে লাগল।

হুঁ। ওই এক একজনের স্বভাব। নেই কাজ তো, খৈ ভাজ! তা বড় লোক বুঝি? টাকা কড়ির অভাব নেই, বসে বসে আজগুবি সব খেয়াল মেটান।

বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম রেখে গেল।

আসুন না বিমলবাবু। কেৎলি থেকে কাপে দুধ চিনি মিশিয়ে র' চা ঢালতে ঢালতে বিমলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে শংকর বললে, বড্ড ঠাণ্ডা, গরম গরম এক কাপ চা মন্দ লাগবে না।

আচ্ছা দিন, বিমলবাবু বলে, আপনার request মানে অনুরোধ।

শংকর বিমলবাবুকে এক কাপ চা ঢেলে দিল। চায়ের কাপে বেশ আরাম করে চুমুক দিতে দিতে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিমলবাবু শংকরের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, তা আপনার সে বন্ধুটির নাম কী?

নাম কিরীটী রায়।

কিরীটী রায়! কোন্ কিরীটী রায়? বর্মার বিখ্যাত দস্যু 'কালো ভ্রমর' প্রভৃতির যিনি রহস্য ভেদ করেছিলেন?

হ্যাঁ।

ভদ্রলোকের নাম হয়েছে বটে। কবে আসবেন তিনি?

আজই তো আসবার কথা ছিল, কিন্তু এলো না তো দেখছি। কাল হয়ত আসবে।

এমন সময় বাইরে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল।

বাস এসে গেছে।

বাস মানে একটা কম্‌পার্টমেণ্ট এঞ্জিন টেনে নিয়ে যায়।

চা পান শেষ করে দাম চুকিয়ে নিয়ে দু'জনে বাসে এসে উঠে বসল।

অল্পক্ষণ বাদেই বাস ছেড়ে দিল।

শীতের অন্ধকার রাত্রি কুয়াশার আবরণের নীচে যেন কুঁক্‌ড়ে জমাট বেঁধে আছে।

খোলা জানালা পথে শীতের হিম শীতল হাওয়া হু-হু করে এসে যেন সর্বাঙ্গ অসাড় করে দিয়ে যায়। এতগুলো গরম জামাতেও যেন মানতে চায় না। দু'জনে পাশাপাশি বসে চুপ চাপ।

কাত্‌রাসগাড় ও তেঁতুলিয়া হল্টের মাঝামাঝি হচ্ছে ওদের গন্তব্য স্থান। কাতরাসগড় স্টেশনে নেমে সেখান থেকে হেঁটে যেতে হয় বেশ খানিকটা পথ।

রাত্রি প্রায় তিনটের সময় গাড়ী এসে কাত্‌রাসগড় স্টেশনে থামল।

অদূরে স্টেশন ঘর থেকে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা উঁকি দিচ্ছে।

একটা সাঁওতাল কুলী এদের অপেক্ষায় বসেছিল।

তার মাথায় সুট্‌কেশ ও বিছানাটা চাপিয়ে একটা বেবী পেট্রোমাক্স জ্বালিয়ে ওরা রওনা হ'য়ে পড়ল।

নিঝুম নিস্তব্ধ কন্‌কনে শীতের রাত্রি।

আগে বিমলবাবু এগিয়ে চলেছে, হাতে তাঁর আলো, চলার তালে দুলছে।

আলোর একঘেয়ে সোঁ সোঁ আওয়াজ রাত্রির নিস্তব্ধ প্রান্তরে মৌনতা ভঙ্গ করছে। মাঝে মাঝে এক একটা দম্‌কা হাওয়া হু-হু করে বয়ে যায়।

মাঝখানে শংকর। সবার পিছনে মোটঘাট মাথায় নিয়ে সাঁওতালটা।

একপ্রকার ঝোঁকের মাথায়ই শংকর এই কাজে এগিয়ে এসেছে। চিরদিন বেপরোয়া জীবনের পথে এগিয়ে চলেছে। এ দুনিয়ায় ভয় ডর বলে কোন কিছু কোন প্রকার বিপদ আপদ তাকে পিছনটান ধরে রাখতে পারে নি। সংসারে একমাত্র বুড়ী পিসিমা। আপনার বলতে আর কেউ নেই। কে-ই বা বাধা দেবে?

বিমলবাবুর মুখ থেকেই শোনে কোলিয়ারীর ইতিহাসটা শংকর। বছর দুই আগে কাত্‌রাসগড় ও তেঁতুলিয়ার মাঝামাঝি একটা জায়গার সন্ধান পেয়ে পূর্ববঙ্গের এক ধনী-পুত্র কোলিয়ারী করবার ইচ্ছায় কাজ শুরু করেন। কিন্তু এক মাস যেতে না যেতেই ম্যানেজার রামহরিবাবু একান্ত আশ্চর্যভাবে তাঁর কোয়ার্টারে এক রাত্রে নিহত হন। দ্বিতীয় ম্যানেজার বিনয়বাবু কিছুদিন বাদে কাজে বহাল হন। দিন পনের যেতে না যেতে তিনিও নিহত হন। তারপর এলেন সুশান্তবাবু, তাঁরও ঐ একইভাবে মৃত্যু ঘট্‌লো। পুলিশ ও অন্যান্য সবাই শত চেষ্টাতেও কে বা কারা যে এঁদের এমন করে খুন করে গেল তার সন্ধান করতে পারলে না। তিন তিন বারই একটি কুলি বা কর্মচারী নিহত হয়নি, তিনবারই ম্যানেজার নিহত হ'ল। মৃত্যুও ভয়ঙ্কর। কে যেন ভীষণভাবে গলা টিপে হতভাগ্য ম্যানেজারের মৃত্যু ঘটিয়েছে, গলার দু'পাশে দু'টি মোটা দাগ এবং গলার পিছন দিকে চারটি কালো কালো গোল ছিদ্র।

শংকর যেখানে কাজ করছিল সেখানকার বড়বাবুর কাছে ব্যাপারটা শুনে একান্ত কৌতূহল বশেই নিজে এ্যাপ্লিকেশন করে কাজটা সে নিয়েছে চার মাসের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে।

এখানে রওনা হবার আগের দিন কিরীটীকে একটা চিঠিতে আগাগোড়া সকল ব্যাপার জানিয়ে, আসবার জন্য লিখে দিয়ে এসেছে।

কিন্তু এই নিশুতি রাতে নির্জন প্রান্তরের মাঝ দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে মনটা কেমন উন্মনা হয়ে যায়, কে জানে এমনি করে নিশ্চিত মরণের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভাল করল কি মন্দ করল।

অদূরে একটা কুকুর নৈশ স্তব্ধতাকে সজাগ করে ডেকে উঠ্‌ল।

ওরা এগিয়ে চলে।

দুই

ভয়ংকর চারটি কালো ছিদ্র

শংকর সেন কিরীটীর কলেজের বন্ধু, একই কলেজ থেকে ওরা বি, এস্-সি পাশ করেছিল।

রসায়নে এম, এস্-সি পাশ করে শংকর মামার বন্ধুর কোলিয়ারীতে কাজ নিয়ে চলে যায়। সেও দীর্ঘ পাঁচ বছরের কথা। কিরীটী তার আগেই রহস্যভেদের জালে পাক খেতে খেতে এগিয়ে গেছে অনেকটা। বছর দুই আগে কলকাতায় দু'জনের একবার ইষ্টারের ছুটিতে দেখা হয়েছিল।

তারপর কেউ কারো সংবাদ পায় নি। হঠাৎ শংকরের চিঠি পেয়ে কিরীটী বেশ খুশীই হলো।

জংলীকে ডেকে সব গোছগাছ করতে বলে দিল।

পরের দিন তুফান মেলে যাবে সব ঠিক, এমন সময় সুব্রত এসে সব লণ্ডভণ্ড করে দিল।

একতলার ঘরে জংলীকে সব গোছগাছ করতে দেখে প্রশ্ন করলে, ব্যাপার কী জংলী?

বাবু কাত্‌রাসগড় চলেছেন।

হঠাৎ?

কী জানি বাবু! আপনাদের কয় বন্ধুর কি মাথার ঠিক আছে? বর্মা, লঙ্কা, হিল্লী, দিল্লীতে আপনারা লাফালাফি করতেই আছেন।

সুব্রত হাসতে হাসতে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। কিরীটী তার বসবার ঘরে একটা সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে চুরুট টানছিল। সুব্রতর পায়ের শব্দে মুদ্রিত চোখেই বললে।

কিবা প্রয়োজনে
এ অকিঞ্চনে
করিলে স্মরণ?

সুব্রত হাসতে হাস্‌তে জবাব দিল ঃ—

আসি নাই সন্ধি হেতু,
ফাটাফাটি রক্তারক্তি
খুনো খুনী,
যাহা হয় কিছু!

পোঁটলা পুঁটলি বাঁধি;
জংলীরে সাথে লয়ে
কোথায় চলেছো;
দিয়ে অভাগা আমারে ফাঁকি?

কিরীটী বললে,

করিয়াছি মন
সুদূর কাত্‌রাসগড়
বারেক আসিব ঘুরি।

নে নে, থামা বাবা তোর কবিতা। সত্যি, হঠাৎ কাত্‌রাসগড় চলেছিস কেন?

কিরীটী সোফার ওপরে সোজা হ'য়ে বসে, হাতের প্রায় নিভন্ত সিগারটা অ্যাসট্রেতে ফেলে বললে।

হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড।

অর্থাৎ!

শোন। কাত্‌রাসগড় ও তেঁতুলিয়া হল্টের মাঝামাঝি একটা কোল্ডফিল্ড আছে! সেটার মালিক পূর্ববঙ্গের কোন এক যুবক জমিদার নন্দন।

তারপর—

কোলিয়ারী স্টার্ট করা হয়েছে; অর্থাৎ তোমার কোলিয়ারীর গোড়া পত্তন আরম্ভ করা হয়েছে মাস দুই হলো।

থামছিস কেন, বল না—।

কিন্তু মাস দুইয়ের মধ্যে তিন-তিনটে ম্যানেজার খুন হয়েছেন।

তার মানে!

আরে সেই মানেই তো solve করতে হবে।

বুঝলাম, তা কী করে ম্যানেজার তিনজন মারা গেলেন?

ময়না-তদন্তে জানা গেছে তাঁদের গলা টিপে মারা হয়েছে, এবং গলার পিছন দিকে মারাত্মক রকমের চারটি করে ছিদ্র দেখতে পাওয়া গেছে। তা ছাড়া অন্য কোন দাগ বা কোন ক্ষত পর্যন্ত নেই।

শরীরের অন্য কোন জায়গায়ও না?

না, তাও নেই!

আশ্চর্য!

তা আশ্চর্যই বটে! সত্যিই আশ্চর্য সেই চারটি কালো ছিদ্র। এবারকার নতুন ম্যানেজার হচ্ছেন আমারই কলেজ ফ্রেণ্ড শংকর সেন। সেও তোমার মতই গোঁয়ার গোবিন্দ ও একজন পাকা অ্যাথলেট্। সে সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে আমায় সেখানে যেতে লিখেছে।

দেখ কিরীটী, সুব্রত বললে, একটা মতলব আমার মাথায় এসেছে।

যথা—

এবারকার রহস্যের কিনারার ভারটা আমার ওপরে ছেড়ে দে। এতদিন তোমার সাকরেদি করলাম, দেখি পারি কিম্বা হারি।

বেশ তো! আমার সঙ্গেই চল না।

না। তা হবে না। পুরোপুরি আমার হাতেই সব কিছু ছেড়ে দিতে হবে। এর মধ্যে তুই মাথা গলাতে পারবি না।

পুরাতন কলেজ ফ্রেণ্ড! যদি অসন্তুষ্ট হয়।

কেন? অসন্তুষ্ট হবেন কেন? আমি হালে পানি না পাই তবে না হয় তুই অবতীর্ণ হবি।

কিন্তু তখন যদি সময় আর না থাকে বিশেষ করে একজনের জীবন মরণ যেখানে নির্ভর করছে।

সব বুঝি কিরীটী। তার নিয়তি যদি ঐ কোলিয়ারীতেই থাকে তবে কেউ তা রোধ করতে পারবে না। তুই আমি তো কোন্ কথা ; স্বয়ং ভগবানও পারবে না।!

তা বটে! তা বেশ, তুই তা হলে কাল রওনা হয়ে যা। শংকরকে একটা চিঠি ড্রপ করে দেবো সমস্ত ব্যাপার খুলে লিখে।

হ্যাঁ! তাই দে! ভয় নেই কিরীটী! সুব্রত রায়কে তুই এটুকু বিশ্বাস করতে পারিস ; বুদ্ধির খেলায় না পারি দেহের সবটুকু শক্তি দিয়েও তাকে প্রাণপণে আগলাবই।

দেহের শক্তিতে সেও কম যায় না সুব্রত। একটু গোলমাল ঠেক্‌লেই কিন্তু তুই আমায় খবর দিস ভাই! অবিশ্যি চিঠি থেকে যতটুকু ধরতে পেরেছি তাতে ব্যাপারটা যে খুব জটিল তা মনে হয় না! এক কাজ করিস তুই বরং প্রত্যেকদিন কতদূর এগুলি বিশদভাবে আমায় চিঠি দিয়ে জানাস, কেমন।

বেশ, সেই কথাই রইল!

তিন

মানুষ না ভূত

কোল্‌ফিল্ডটা প্রায় উনিশ কুড়ি বিঘে জমি নিয়ে।

ধু-ধু প্রান্তর। তার মাঝে একপাশে অনেকটা জায়গা নিয়ে কুলিবস্তী বসান হয়েছে। টেম্‌পোরারী সব টালি ও টিনের সেড্‌ তুলে ছোট ছোট খুপ্‌রী তোলা হয়েছে। কোন কোনটার ভিতর থেকে আলোর কম্পিত শিখার মৃদু আভাস পাওয়া যায়। অল্প দূরে পাকা গাঁথ্‌নী ও উপরে টালির সেড্‌ দিয়ে ম্যানেজারের ঘর তোলা হয়েছে এবং প্রায় একই ধরণের আর দুটি কুঠী ঠিকাদার ও সরকারের জন্য করা হয়েছে। ম্যানেজারের কোয়াটার এতদিন তালা বন্ধই ছিল বিমলবাবু পকেট থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে দেয়।

কোয়ার্টারের মধ্যে সর্বসমেত তিনখানি ঘর, একখানি রান্নাঘর ও বাথ্‌রুম।

মাঝখানে ছোট্ট একটি উঠান। দক্ষিণের দিকে বড় ঘরটায় একটা কুলি একটা ছাপর খাটের ওপরে শংকরের শয্যা খুলে বিছিয়ে দিল।

আচ্ছা, আপনি তা হলে হাতমুখ ধুয়ে নিন স্যার। ঠাকুরকে দিয়ে আপনার জন্য লুচি ভাজিয়ে রেখে দিয়েছি, পাঠিয়ে দিচ্ছি গিয়ে। বংশী এখানে রইল।

বিমলবাবু নমস্কার জানিয়ে চলে গেল।

শংকর শয্যায় ওপরে গা ঢেলে দিল।

রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল।

কিন্তু কুয়াশার আবছায় কিছু বুঝবার জো নেই।

একটু বাদে বিমলবাবুর ঠাকুর লুচি ও গরম দুধ দিয়ে গেল। দু'চারটে লুচি খেয়ে দুধটুকু এক ঢোকে শেষ করে শংকর ভাল করে পালকের লেপটা গায়ে চাপিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন বিমলবাবুর ডাকে ঘুম ভেঙে শংকর দরজা খুলে যখন বাইরে এসে দাঁড়াল, কুয়াশা ভেদ করে সূর্যের অরুণ রাগ তখন ঝিলিক হানছে।

সারাটা দিন কাজকর্ম দেখে শুনে নিতেই চলে গেল।

বিকালের দিকে সুব্রত এসে পৌছাল।

কিরীটী তার হাতে একটা চিঠি দিয়েছিল।

সুব্রতর সঙ্গে পরিচিত হয়ে শংকর বেশ খুশীই হল।

তারও দিন দুই পরের কথা।

এ দুটো দিন নির্বিঘ্নে কেটে গেছে।

সন্ধ্যার দিকে বাসায় ফিরে আবশ্যকীয় কয়েকটা কাগজপত্র শংকর টেবিল ল্যাম্পের আলোয় বসে দেখছে।

সুব্রত বিকালের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছে, এখনও ফেরে নি! বাইরে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

শংকর উৎকর্ণ হয়ে উঠল, কে?

আমি স্যার। চন্দন সিং।

ভিতরে এসো চন্দন।

চন্দন সিং অল্প বয়সের পাঞ্জাবী যুবক।

এই কোলিয়ারীতে ম্যানেজারের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হয়ে কাজে বহাল হয়েছে।

কি খবর চন্দন সিং?

আপনি আমায় ডেকেছিলেন?

কই না! কে বললে? কতকটা আশ্চর্য হয়েই শংকর প্রশ্ন করলে।

বিমলবাবু অর্থাৎ সরকার মশাই বললেন।

বিমলবাবু বললেন! তারপর সহসা নিজেকে সামলে নিয়ে বললে ঃ ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে! বসো ঐ চেয়ারটায়। তোমার সঙ্গে গোটা কতক কথা আছে।

চন্দন সিং একটা মোড়া চেয়ে নিয়ে বসল।

এখানকার চাকরী তোমার কেমন লাগছে চন্দন?

পেটের ধান্দায় চাকরী করতে এসেছি স্যার, আমাদের পেট ভরলেই হলো স্যার।

না, তা ঠিক বলছি না। এই যে পর পর দু'জন ম্যানেজার এমনি ভাবে নিহত হলেন...

সহসা চন্দন সিংয়ের মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়াতে শংকর চমকে উঠলো। চন্দনের সমগ্র মুখখানি ব্যেপে যেন একটা ভয়াবহ আতঙ্ক ফুটে উঠেছে। কিন্তু চন্দন সিং সেটা সামলে নিল।

শংকর বলতে লাগল, তোমার কি মনে হয় সে সম্পর্কে?

চন্দন সিংয়ের মুখের দিকে চেয়ে মনে হয় যেন কী একটা কিছু বেচারী প্রাণপণে এড়িয়ে যেতে চায়।

তুমি কিছু বলবে চন্দন?

সোৎসুকভাবে শংকর চন্দন সিংয়ের মুখের দিকে তাকাল।

একটা কথা যদি বলি অসন্তুষ্ট হবেন নাতো স্যার?

না, না—বল কি কথা।

আপনি চলে যান স্যার। এ চাকরী করবেন না।

কেন? হঠাৎ একথা বলছো কেন?

না স্যার, চলে যান আপনি ; এখানে কারও ভাল হতে পারে না।

ব্যাপার কি চন্দন? এ বিষয়ে তুমি কি কিছু জান? টের পেয়েছো কিছু?

ভূত!...আমি নিজের চোখে দেখেছি।

ভূত!...

হ্যাঁ। অত বড় দেহ কোন মানুষ হ'তে পারে না!

আমাকে সব কথা খুলে বল চন্দন সিং।

আপনার আগের ম্যানেজার সুশান্তবাবু মারা যাবার দিন দুই আগে বেড়াতে বেড়াতে পশ্চিমের মাঠের দিকে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চারিদিকে অস্পষ্ট আঁধার; হঠাৎ মনে হলো পাশ দিয়ে যেন ঝড়ের মত কী একটা সন্ সন্ করে হেঁটে চলে গেল। চেয়ে দেখি লম্বায় প্রায় হাত পাঁচ ছয় হবে। আগাগোড়া সর্বাঙ্গ একটা বাদামী রংয়ের আলখাল্লায় ঢাকা।

সেই অস্বাভাবিক লম্বা মূর্তিটা কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ একটা পৈশাচিক অট্টহাসি শুনতে পেলাম। সে হাসি মানুষের হতে পারে না।

তারপর—।

তারপরের পর দিনই সুশান্তবাবুও মারা যান। শুধু আমিই নয়; সুশান্তবাবুও মরবার আগের দিন সেই ভয়ংকর মূর্তি নিজেও দেখেছিলেন।

কি রকম?

রাত্রি প্রায় বারোটার সময়...সে রাত্রে কুয়াশার মাঝে পরিষ্কার না হলেও অল্প অল্প চাঁদের আলো ছিল—রাত্রে বাথরুমে যাবার জন্য উঠেছিলেন...হঠাৎ ঘরের পিছনে একটা খুক্ খুক্ কাশির শব্দ পেয়ে কৌতূহলবশে জানালা খুলতেই দেখলেন, সেই ভয়ংকর মূর্তি মাঠের মাঝখান দিয়ে ঝড়ের মত হেঁটে যাচ্ছে।

সে মূর্তি আমি আজ স্বচক্ষে দেখলাম শংকরবাবু! দু'জনে চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখে বক্তা সুব্রত! সে এর মধ্যে কখন এক সময় ফিরে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।

চার

আঁধারে বাঘের ডাক

কী দেখছেন?

ভূত। চন্দনবাবুর ভূত! সুব্রত একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললে। তারপর চন্দন সিংয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি বুঝি আমাদের শংকরবাবুর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট?

চন্দন সিং সম্মতিসূচক ভাবে ঘাড় হেলাল।

এখানকার ঠিকাদার কে চন্দনবাবু?

ছট্টুলাল।

তার সঙ্গে একটিবার আলাপ করতে চাই! কাল একটিবার দয়া করে যদি পাঠিয়ে দেন তাকে সন্ধ্যার দিকে।

দেবো, নিশ্চয়ই দেবো।

আচ্ছা চন্দনবাবু! আপনাকে কয়টা কথা যদি জিজ্ঞাসা করি আপনি নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবেন না?

সে কি কথা। নিশ্চয়ই না। বলুন কি কথা?

আমি শংকরবাবুর বন্ধু। এখানে বেড়াতে এসেছি জানো তো।

জানি—।

কিন্তু এখানে পৌঁছে ওঁর আগেকার ম্যানেজারের সম্পর্কে যে কথা শুনলাম তাতে বেশ ভয়ই হয়েছে আমার।

নিশ্চয়ই, এ তো স্বাভাবিক। আমিও ওঁকে বলেছিলাম এখানকার কাজে ইস্তফা দিতে।

আমার মনে হয় ওঁর পক্ষে ও জায়গাটা তেমন নিরাপদ নয়।

আমারও তাই মত। সুব্রত চিন্তিতভাবে বললে।

কি বলছেন সুব্রতবাবু।

হ্যাঁ—ঠিকই বলছি—

কিন্তু স্রেফ একটা গাঁজাখুরী কথার ওপরে ভিত্তি করে এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে আমার মন কিন্তু মোটেই সায় দেয় না। বরং শেষ পর্যন্ত দেখে তবে এ জায়গা থেকে নড়ব—তাই আমার ইচ্ছা সুব্রতবাবু; শংকর বললে।

বড় রকমের একটা বিপদ আপদ যদি ঘটে এর মধ্যে শংকরবাবু?... অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপার, কখন কি হয় বলা তো যায় না।

যে বিপদ এখনও আসেনি, ভবিষ্যতে আসতে পারে তার ভয়ে লেজ গুটিয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকব এই বা কোন্ দেশী যুক্তি আপনাদের? শংকর বললে।

যুক্তি হয়ত নেই শংকরবাবু, কিন্তু অ-যুক্তিটাই বা কোথায় পাচ্ছেন এর মধ্যে?—সুব্রত বললে।

কিন্তু—চন্দন সিং বলে ঃ

শুনুন, শুধু যে ঐ ভীষণ মূর্তি দেখেছি তাই নয় স্যার। মাঝে মাঝে গভীর রাতে কী অদ্ভুত শব্দ, কান্নার আওয়াজ মাঠের দিক থেকে শোনা যায়। এ ফিল্ডটা অভিশাপে ভরা।...কেউ বাঁচতে পারে না। বাঁচা অসম্ভব। গত তিনবার ম্যানেজার বাবুদের উপর দিয়ে গেছে...কে বলতে পারে এর পরের বার অন্য সকলের উপর দিয়ে যাবে না।

সে রাত্রে বহুক্ষণ তিনজনে নানা কথাবার্তা হলো।

চন্দন সিং যখন বিদায় নিয়ে চলে গেল রাত্রি তখন সাড়ে দশটা হবে।

শংকর একই ঘরে দু'পাশে দুটো খাট পেতে নিজের ও সুব্রতর শোবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে।

শংকরের ঘুমটা চিরদিনই একটু বেশী। শয্যায় শোবার সঙ্গে সঙ্গেই সে নাক ডাকতে শুরু করে দেয়।

আজও সে শয্যায় শোবার সঙ্গে সঙ্গেই নাক ডাকতে শুরু করে দিল।

সুব্রত বেশ করে কম্বলটা মুড়ি দিয়ে মাথার কাছে একটা টুলের ওপরে বসে টেবিল ল্যাম্পটা বসিয়ে তার আলোয় কিরীটীকে চিঠি লিখতে বসল।

কিরীটী,

কাল তোকে এসে পৌঁছানর সংবাদ দিয়েছি; আজ এখানকার আশপাশ অনেকটা ঘুরে এলাম। ধু-ধু মাঠ, যেদিকে তাকাও জনহীন নিস্তব্ধতা যেন চারিদিকে প্রকৃতির কণ্ঠনালী চেপে ধরেছে।

বহুদূরে কালো কালো পাহাড়ের ইসারা; প্রকৃতির বুক ছুঁয়ে যেন মাটির ঠাণ্ডা পরশ নিচ্ছে। বর্তমানে যেখানে এদের কোল্‌ফিল্ড বসেছে তারই মাইল খানেক দূরে বহু কাল আগে এক সময় একটা কোল্‌ফিল্ড ছিল। আকস্মিক ভাবে একরাত্রে সে খনিটা নাকি ধ্বসে মাটির বুকে বসে যায়। এখনো মাঝে মাঝে বড় বড় গর্ত মত আছে। রাতের অন্ধকারে সেই গর্তর মুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বের হয়।

অভিশপ্ত খনির বুকে দুর্জয় আক্রোশ এখনও যেন লেলিহান অগ্নিশিখায় আত্মপ্রকাশ করে। আজ সন্ধ্যার দিকে বেড়িয়ে ফিরছি; অন্ধকাব চারিদিকে বেশ ঘনিয়ে এসেছে, সহসা পিছনে দ্রুত পায়ের শব্দ শুনে চমকে পিছন

পানে ফিরে তাকালাম। আশ্চর্য! কেউ যে এত লম্বা হ'তে পারে ইতিপূর্বে আমার ধারণা ছিল না।

লম্বায় প্রায় ছয় হাত হবে। যেমন উঁচু লম্বা তেমনি মনে হয় যেন বলিষ্ঠ গঠন। আগাগোড়া একটা ধূসর কাপড় মুড়ি দিয়ে হন হন করে যেন একটা ঝোড়ো হাওয়ার মত আমার পাশ দিয়ে হেঁটে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে মাঠের অপর প্রান্তে মিলিয়ে গেল।

আমি নির্বাক হয়ে সেই অপসৃয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় একটা অদ্ভুত বাঘের ডাক কানে এসে বাজল।

এত কাছাকাছি, মনে হলো যেন আশপাশে কোথায় বাঘটা ওৎ পেতে শিকারের আশায় বসে আছে।

তুই হয়ত বলবি আমার শুনবার ভুল, কিন্তু পর পর তিনবার স্পষ্ট বাঘের ডাক আমি শুনেছি।

তাছাড়া তুই তো জানিস সাহস আমার নেহাৎ কম নয়, কিন্তু সেই সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকার নিঝুম নিস্তব্ধ প্রান্তরের মাঝে গুরুগম্ভীর সেই শার্দুলের ডাকে আমার শরীরের মধ্যে কেমন যেন অকস্মাৎ শির শির করে উঠল। দ্রুত পা চালিয়ে দিলাম, বাসায় ফিরবার জন্য।

চিঠিটা এই পর্যন্ত লেখা হয়েছে, এমন সময় রাতের নিস্তব্ধ আঁধারের বুকখানা ছিন্ন ভিন্ন করে এক ক্ষুধিত শার্দুলের ডাক জেগে উঠল।

একবার, দু'বার, তিনবার।

সুব্রত চমকে শয্যা থেকে লাফিয়ে নীচে নামল।

তাড়াতাড়িতে নামতে গিয়ে ধাক্কা লেগে টেবিল ল্যাম্পটা মাটিতে ছিটকে পড়ে চুরমার হয়ে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

আলোর চিমনিটা ভাঙার ঝন ঝন শব্দে ততক্ষণে শংকরের ঘুমটাও ভেঙে গেছে।

ত্রস্তে শয্যার ওপরে বসে চকিত স্বরে প্রশ্ন করলে, কে?

শংকরবাবু! আমি সুব্রত।

সুব্রতবাবু!

হ্যাঁ, ধাক্কা লেগে আলোটা ছিটকে পড়ে ভেঙে নিভে গেল।

বাইরে একটা চাপা অস্পষ্ট গোলমালের শব্দ কানে এসে বাজে।

অনেকগুলো লোকের মিলিত এলোমেলো কণ্ঠস্বর রাতের নিস্তব্ধতায় যেন একটা শব্দের ঘূর্ণাবর্ত তুলেছে।

বাইরে কিসের একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছে না, সুব্রতবাবু?

হ্যাঁ।

কিসের গোলমাল?

বুঝতে পারছি না, তবে যতদূর মনে হয়, গোলমালটা কুলি বস্তির দিক থেকে আসছে, সুব্রত বললে। চলুন একবার; খবর নেওয়া যাক।

বেশ চলুন।

দু'জনে দুটো লং কোট গায়ে চাপিয়ে মাথায় উলের নাইট ক্যাপ পরে দুটো টর্চ হাতে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হলো।

গোলমালটা ক্রমে যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ঘরের দরজা খুলে সুব্রত বেরুতে যাবে, এমন সময় আকাশ পাতাল ফাটান একটা বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জন রাত্রির আঁধারকে যেন ফালি ফালি করে জেগে উঠল আবার অকস্মাৎ।

এবং এবারেও একবার, দু'বার, তিনবার।

সুব্রতর সমস্ত শরীর লোহার মত শক্ত ও কঠিন, মনের সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রীগুলি সজাগ হয়ে উঠেছে।

শংকর ঘরের মাঝখানে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গেছে; যেন সহসা একটা তীব্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গাঘাতে ও একেবারে অসার পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। প্রথমটা কারো মুখে কোন কথাই নেই। কিন্তু সহসা সুব্রত যেন ভিতর থেকে প্রবল একটা ধাক্কা খেয়ে সজাগ হয়ে উঠে ভিতর থেকে এক ঝটকায় ঘরের খিল খুলে বাইরের অন্ধকার বারান্দায় টর্চটা ফেলে লাফিয়ে পড়ল।

আগাগোড়া সমগ্র ব্যাপারটা ঘটতে বোধ হয় কুড়ি সেকেণ্ডও লাগেনি।

সুব্রতকে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে প্রথমটা শংকর বেশ একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই সেও সুব্রতকে অনুসরণ করলে।

বাইরের অন্ধকার বেশ ঘন ও জমাট। সুব্রতর হাতের টর্চের তীব্র বৈদ্যুতিক আলোর রশ্মি অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলে চারিদিকে ঘুরে এল ; কিন্তু কোথাও কিছু নেই।

বাঘ তো দূরের কথা, একটা পাখি পর্যন্ত নেই।

ততক্ষণে শংকরও সুব্রতর পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু বাঘের ডাক তো স্পষ্ট শোনা গেছে।

তবে?

বুঝতে পারছি না সত্যি সত্যিই একি তবে ভৌতিক ব্যাপার?

বলতে বলতে শংকর আবার হাতের টর্চের বোতমটা টেপে। মাঠের মাঝখানে কুলিবস্তি ও কোলিয়ারীতে যাবার পথে কতকগুলি কাট্ যুঁই ও বাবলা গাছ চোখে পড়ে। সেইদিকে শংকরের হাতের অনুসন্ধানী বৈদ্যুতিক

বাতির রশ্মি পড়তেই দু'জনে চমকে উঠল...কে? কে ওখানে, একটা কালো মূর্তি...তার গায়ে সাদা সাদা ডোরা কাটা।

চকিতে সুব্রত কোমরবন্ধ থেকে আগ্নেয়-অস্ত্রটা টেনে বের করলে এবং চাপা গলায় বললে ঃ ওই দেখুন বাঘ। সরে যান। গুলি করি।

শেষের কথাগুলো উত্তেজনায় যেন বেশ তীক্ষ্ণ ও সজোরে সুব্রতর কণ্ঠ ফুটে বের হয়ে এল।

স্যার আমি।...গুলি করবেন না স্যার।...ইয়োর মোস্ট ফেইথফুল এণ্ড ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট।

একটা চাপা ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর কানে এসে বাজল।

কে?

আমি বিমল দে।...কোলিয়ারীর সরকার।

বিমলবাবু! শংকরের বিস্মিত কণ্ঠ চিরে বের হয়ে এল।

দু'জনে এগিয়ে গেল।

শংকর বিমলবাবুর গায়ের ওপরে টর্চের আলো ফেলে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে বিমলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, এত রাত্রে এখানে এই শীতে মাঠের মধ্যে কী করছিলেন?

আগাগোড়া একটা সাদা ডোরা কাটা ভারী কালো কম্বলে মুড়ি দিয়ে বিমলবাবু সামনে দাঁড়িয়ে...

আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম স্যার।

আমার কাছে যাচ্ছিলেন? শংকর প্রশ্ন করলে।

হ্যাঁ। কুলি ধাওড়ায় একটা লোক খুন হয়েছে।

খুন হয়েছে!...সুব্রত চমকে উঠল।

হ্যাঁ বাবু, খুন হয়েছে।

গোলমালটা এখন বেশ সুস্পষ্টভাবে কানে এসে বাজছে।

চলুন, দেখে আসা যাক।

সুব্রতর দিকে তাকিয়ে শংকর বললে।

আগে শংকর, মাঝখানে বিমলবাবু ও সর্বশেষে সুব্রত টর্চের আলো ফেলে কুলিবস্তির দিকে এগিয়ে চলল।

মাথার উপরে তারায় ভরা রহস্যময়ী অন্ধকার রাতের আকাশ কী যেন একটা ভৌতিক বিভীষিকার প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব।

আজ রাতে কুয়াশার লেশমাত্র নেই।

পাঁচ

আবার ভয়ঙ্কর চারটি ছিদ্র

সকলেই নির্বাক। কারো মুখে কোন কথা নেই। শুধু রাতের স্তব্ধ মৌনতার বুকে জেগে উঠেছে কতকগুলো ভয়ার্ত লোকের একটানা গোলমালের এলোমেলো একটা ক্রমবর্দ্ধমান শব্দের রেশ।

সহসা সুব্রত কথা বললে, আপনার কোয়ার্টারটা কোথায় বিমলবাবু?

কেন, এখানেই তো থাকি!

এখানেই মানে? কোথায়? মানে 'লোকেশন'টা চাচ্ছি!

কুলীদের ধাওড়ার লাগোয়া। আমি আর 'রেজিং' বাবু একই ঘরে থাকি।

আপনাদের রেজিং বাবুর নাম কি?

রামলোচন পোদ্দার।

তিনি কোথায়?

তিনি ধাওড়ার দিকে গেছেন।

গোলমাল শুনবার আগে ঘুমোচ্ছিলেন বুঝি?

না। রামলোচনবাবু ঘুমোচ্ছিলেন; আমি জেগে বসে হিসাবপত্র দেখছিলাম।

কথা বলতে বলতে ততক্ষণ তারা কোলফিল্ডের কাছাকাছি এসে পড়েছে! অদূরে অন্ধকারে অস্পষ্টভাবে চানকের উপরের চাকাটা দেখা যাচ্ছে।

চারিদিকে একটা থমথমে ভাব এবং সেই থমথমে প্রকৃতির বুকে একটা অস্পষ্ট গোলমালের সুর কেমন যেন ভৌতিক বলে মনে হয়।

ধাওড়ায় তখন সাঁওতাল পুরুষ ও কামিন্ সকলেই প্রায় এক জায়গায় ভিড় করে মৃদু গুঞ্জনে জটলা পাকাচ্ছে। শংকরকে দেখে সকলে ভিড় ছেড়ে সরে দাঁড়াতে লাগল।

একটা ঘরের দরজার সামনে সকলে এসে দাঁড়াল।

একটা বলিষ্ঠ ২৪।২৫ বছরের সাঁওতাল যুবক চিৎ হয়ে পড়ে আছে।

সামনেই একটা কেরাসিনের ল্যাম্প দপ্ দপ্ করে জ্বলছে প্রচুর ধূম উদ্‌গিরণ করে।

প্রদীপের লাল আলোর মলিন আভা মৃত সাঁওতাল যুবকের মুখের উপরে প্রতিফলিত হয়ে মৃতের মুখখানাকে যেন আরো বীভৎস, আরো ভয়ঙ্কর করে তুলেছে।

মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া কালো চুলগুলো এলোমেলো। গোল গোল বড় বড় চোখের মণি দুটো যেন চক্ষু কোটর থেকে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে

চায়। জিভটা খানিকটা বের হয়ে এসেছে মুখ-বিবর থেকে। সমগ্র মুখখানি ব্যাপী একটা ভয়াবহ বিভীষিকা ফুটে উঠেছে।

সুব্রত মৃতের মুখের ওপরে শক্তিশালী টর্চের উজ্জ্বল আলো ফেলল।

অত্যুজ্জ্বল আলোয় মৃত ব্যক্তির গলার দিকে নজর পড়তেই সুব্রত চমকে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি প্রখর করে দেখতে লাগল।

গলার দু'পাশে আঙুলের দাগ যেন চেপে বসে গেছে।

নাকের নীচে হাত দিয়ে দেখলে, কোথাও আর শ্বাসপ্রশ্বাসের লেশমাত্র নেই।

অনেকক্ষণ মারা গেছে। হিম কঠিন অসাড়।

টর্চের আলোয় মৃতদেহটাকে সুব্রত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। মৃতদেহটিকে উপুড় করে দিতেই ও লক্ষ্য করল রক্তে কালো কালো চারিটি ছিদ্র ঘাড়ের দিকে যেন কি এক বিভীষিকায় ফুটে উঠেছে। মনে হয় যেন কোন তীক্ষ্ণ ধারালো অস্ত্রের অগ্রভাগ দিয়ে পাশাপাশি পর পর চারটি ছিদ্র করা হয়েছে।...

শংকর প্রশ্ন করলে, কী দেখছেন সুব্রতবাবু?...উঠে আসুন।...

সুব্রত টর্চটা নিভিয়ে দিল, হ্যাঁ চলুন।...কী ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু!...

সকলে বাইরে এসে দাঁড়াল।

শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে ক্ষীণ চাঁদের একটুকরো জেগে উঠেছে যেন বাঁকানো ছোরা একখানি। সহসা কে এক নারী আলুলায়িতা কুন্তলা, পাগলিনীর মতই শংকরবাবুর পায়ের উপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, বাবুরে হামার কি হলো রে—

সকলে চমকে উঠল।

একজন বৃদ্ধ গোছের সাঁওতাল এগিয়ে এল, উঠ সোহাগী। কী করবি বল—

কে এই মেয়েটি বিমলবাবু? শংকরবাবু প্রশ্ন করলেন।

ঝণ্টুর ইস্ত্রি বাবু। সোহাগী।

কে ঝণ্টু?

যে লোকটা মারা গেছে।

তুই এখন যা সোহাগী।...তোর একটা ব্যবস্থা করে দিব রে। শংকর বলে। সান্ত্বনা দেয়।

ঝণ্টুকে ছেড়ে আমি থাকতে লারব বাবু গো। ঝণ্টুকে তুই আমার ফিরায়ে দে বাবু।—

কেঁদে আর কি করবি বল?—যা ঘরে যা।

না। না। ঘরকে আমি যাবো নারে।—ঘর আমার আঁধার হয়ে গেল।—ঝণ্টু আমার নাইরে—ওরে ঝণ্টুরে।

চুপ কর। সোহাগী চুপ কর।—

সহসা বিমলবাবু প্রচণ্ড বেগে ধমক দিয়ে উঠলেন; এই মাগী থাম।—ভূতে তোর স্বামীকে খুন করেছে তার ম্যানেজার বাবু কি করবে।— যা ওঠ ওঠ।—যত সব নচ্ছার বদমায়েস এসে জুটেছে।—যা ভাগ!—যা! অন্ধকার রাতে আনমনে পথ চলতে চলতে সহসা একটা তীব্র আলোর ঝাপটা মুখে এসে পড়লে পথিক যেমন ক্ষণেকের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, সোহাগীও তেমনি সহসা যেন তার সকল শোক ভুলে মুহূর্তের জন্য মৌন বাকহারা হয়ে ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে বিমলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং পায়ে পায়ে পিছন পানে হেঁটে সরে যেতে লাগল।

চলুন ম্যানেজারবাবু।—ওদিকে রাত প্রায় শেষ হয়ে এল।— পুলিশে খবর দিতে হবে, লাস ময়না তদন্তে যাবে।— যত সব হাঙ্গামা। পোষাবে না বাপু এখানে আর আমার চাকরী করা। ভূতের আড্ডা। কে জানে কবে হয়ত আবার আমারই ওপরে চড়াও হবে।—বাপ, মা, ছেলে পিলে ছেড়ে এই বিদেশ-বিভূঁয়ে প্রাণটা শেষে কী খোয়াব?—

চলুন শংকরবাবু। কোয়ার্টারে ফেরা যাক। সুব্রত বলে।

সকলে কুলী ধাওড়া ছেড়ে কোয়ার্টারের দিকে পা বাড়াল; সকলেই নীরবে পথ অতিবাহিত করে চলেছে। কারও মুখে কোন কথা নেই—

পথ চলতে চলতে এক সময় বিমলবাবু বলল, বলছিলাম না, এই কোলফিল্ডটা একটা পরিপূর্ণ অভিশাপ। এখানে কারও মঙ্গল নেই। কিন্তু এবারে দেখছি আপনি স্যার বেঁচে গেলেন। এর আগের বারের আক্রোশগুলো ম্যানেজারবাবুদের উপর দিয়েই গেছে এবং আগেকার ঘটনা অনুযায়ী বিপদটা আপনার ঘাড়েই আসা উচিত ছিল। তা যাক্, ভালই হলো একদিক দিয়ে।

তার মানে? সহসা সুব্রত প্রশ্ন করে বসল।

বিমলবাবু যেন সুব্রতর প্রশ্নে একটু থতমত খেয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, মানে, মানে আর কি? ওই কুলীগুলোর জীবনের আর কী দাম আছে বলুন? ওদের দু'দশটা মরলে কী এসে গেল?

সহসা স্তব্ধ রাতের মৌনতাকে ছিন্নভিন্ন করে সোহাগীর করুণ কান্নার আকুল রেশ কানে এসে বাজল সবার। ঝণ্টুরে—তু ফিরে আয় রে। ওরে আমার ঝণ্টুরে।

সুব্রতর পায়ের গতিটুকু যেন সহসা লোহার মত ভারী হয়ে অনড় হয়ে গেল। বিমলবাবুর দিকে ফিরে শ্লেষমাখা সুরে সে বলল, তা যা বলেছেন বিমলবাবু। দুনিয়ার আবর্জনা ওই গরীবগুলো।—যাদের মরণ ছাড়া আর গতি নেই ও সংসারে তারা মরবে বৈকি।

নিশ্চয়ই। আপনিই বলুন না, ওই জংলীগুলোর প্রাণের দাম কিই-বা আছে? বিমল বলে ওঠে।

ছয়

খাদে রহস্যময় মৃত্যু

বাকী রাতটুকু সুব্রতর চোখে আর ঘুম এল না। সে আবার অর্ধসমাপ্ত চিঠিখানা নিয়ে বসল।

কিরীটী। চিঠিটা তোর শেষ করেই রেখেছিলাম, কিন্তু সেই রাত্রেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ঘটনাটা তোকে না লিখে পারলাম না। কুলী ধাওড়ায় ঝণ্টু নামে এক সাঁওতাল যুবক রাত্রে খুন হয়েছে। বিমলবাবু প্রমাণ করতে চান ব্যাপারটা আগাগোড়াই ভৌতিক। অর্থাৎ ভূতের কাণ্ড। তবে মৃতের গলার পিছন দিকে আগের মতই চারটি ভয়ঙ্কর কালো ছিদ্র আছে দেখলাম। আমার কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা যেন খুবই সহজ। জলের মতই সহজ।...তোর চিঠির প্রত্যুত্তরের আশায় রইলাম। চিঠি পেলেই ভাবছি শ্রীমানকে পুলিশের হাতে তুলে দেবো। কেন না ওই ধরনের শয়তান খুনীদের এমন সহজভাবে দশজনার সঙ্গে চলে ফিরে বেড়াতে দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? আমার যতদূর মনে হয় আর সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ব্যাপারটার একটা সহজ মীমাংসা করে দিতে পারব। তোর উপস্থিতির বোধ হয় আর প্রয়োজনই হবে না। আজ এই পর্যন্ত। ভালবাসা রইলো। তোর সুব্রত।

চিঠিটা শেষ করে সুব্রত চেয়ার থেকে উঠে একটা আড়মোড়া ভাঙলো।

রাতের আকাশের বিদায়ী আঁধারের দিগ্বলয়ের প্রান্তকে তখন ফিকে করে তুলেছে।

সুব্রত বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

শীতের হাওয়া ঝিরঝির করে সুব্রতর শ্রান্ত ও ক্লান্ত দেহ মনকে যেন জুড়িয়ে দিয়ে গেল।

ঘুমান নি বুঝি সুব্রতবাবু?

শংকরের গলার স্বর শুনে সুব্রত ফিরে দাঁড়াল।

এই যে আপনিও উঠে পড়েছেন দেখছি। ঘুমাতে পারলেন না বুঝি?

না, ঘুম এলো না। কিন্তু গত রাত্রের ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনার কি মনে হয় সুব্রতবাবু?

দেখুন শংকরবাবু, ব্যাপারটা যে খুব কঠিন বা জটিল তা কিছু নয়, তবে এটা ঠিক যে, এর আগে যে সব খুন এখানে হয়েছে তার সমস্ত রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে চট্ করে উপনীত হতে পারছি না। যতদূর

মনে হয় এর পিছনে একটা দল আছে অর্থাৎ একদল শয়তান এই ভয়ঙ্কর খুনখারাপি করে বেড়াচ্ছে।

বলেন কি?

হ্যাঁ। তাই। একজন লোকের ক্ষমতা নেই tactfully এতগুলো লোকের মধ্যে থেকে এমন পরিষ্কারভাবে খুন করে গা ঢাকা দিতে পারে।—

হাত মুখ ধুয়ে চা পান করতে করতে শংকর আর সুব্রত গত রাত্রের ঘটনারই আলোচনা করছিল, এমন সময় একটা কুলী ছুটতে ছুটতে এসে হাজির, বাবু গো সর্বনাশ হয়েছে।...

কি হয়েছে—

১৩ নম্বর 'কাঁথি'তে পিলার ধ্বসে গিয়ে কাল রাত্রে দশজন সাঁওতাল কুলী মারা গেছে।

শংকর চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল।

সর্বনাশ! এক রাত্রে দশটা লোকের একসঙ্গে মৃত্যু! কিন্তু রাত্রে তো এ মাইনে কাজ চালাবার কথা নয়। তবে? তবে কেমন করে এ দুর্ঘটনা ঘটলো?

'রেজিংবাবু' কোথায় রে টুইলা? শংকর কুলীটাকে প্রশ্ন করল।

রেজিং বাবু তো ওধার পানেই আসতেছে দেখলুম বাবু।...দেখা গেল সামনের অপ্রশস্ত কাঁচা কয়লার গুঁড়ো ছড়ান রাস্তাটা ধরে একপ্রকার দৌড়াতে দৌড়াতে রামলোচন পোদ্দার আসছে। রামলোচনবাবু এসে শংকরের সামনে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। মোটাসোটা চর্বিবহুল নাদুস নুদুস চেহারাখানি, পরনে খাকি হাফ্‌প্যাণ্ট ও খাকি হাফ্‌সার্ট। ঠোঁটের ওপরে বেশ একজোড়া পাকান গোঁফ। মাথায় সুবিস্তীর্ণ টাক চক্‌চক্ করে। বয়েস বোধকরি ৪০।৪৫ এর মধ্যে।

এ কি শুনছি রামলোচনবাবু?

সর্বনাশ হয়ে গেছে, ঠিকই শুনেছেন স্যার—একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেছে। এই খনি বুঝি আর চালানো গেল না।

সব খুলে বলুন—

কাল রাত্রে ১৩নং কাঁথিতে পিলার ধ্বসে গিয়ে দশজন কুলী চাপা পড়ে মারা গেছে।

কাল রাত্রে মানে।—অর্থাৎ আপনি বলতে চান রাত্রিতে কাল কয়লা খনিতে কাজ হচ্ছিল?

আজ্ঞে না।—

আজ্ঞে না! তার মানে? এই তো বললেন কাল রাত্রে ১৩নং কাঁথিতে দশজন মারা গেছে।

আজ্ঞে তা তো গেছেই—

খনিতে কয়লা কাটার কাজ না থাকলে কেন তারা সেখানে গিয়েছিল? নিশ্চয়ই খনির মধ্যে লুকোচুরি খেলতে নয়। এ খনির নিয়ম কি? পাঁচটার মধ্যে খনির সমস্ত কাজ বন্ধ হ'য়ে যায় তো?—রাত্রে কোন কাজ হয় না।

আজ্ঞে।

তবে তারা রাত্রে খনির মধ্যে কি করে গেল? চানক সন্ধ্যা পাঁচটার পর খাদে আর লোক নামায় না তো?—

না তা নামায় না। এবং রাত্রি সাতটা পর্যন্ত 'চানক' খোলা থাকে খাদের লোক শুধু উঠাবার জন্য।

এমনও তো হতে পারে শংকরবাবু। সেই দশটি লোক গত রাত্রে খাদ থেকে মোটে ওঠেইনি, খাদেই ছিল? হঠাৎ সুব্রত বলে।

Impossible. খনির কুলীদের একটা লিস্ট আছে নামের। খাদে যারা নামে ও কাজ শেষে খাদ থেকে উঠে আসে নামের registry-র সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয় তাদের নাম। এতে ভুলচুক হওয়া সম্ভব নয় সুব্রতবাবু।

কিন্তু আগে সব কিছুর খোঁজ নেওয়া দরকার শংকরবাবু। চলুন দেখা যাক খোঁজ নিয়ে, আসলে ব্যাপারটা কি।

বেশ চলুন।

তখনি দু'জনে রামলোচন ও টুইলারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

পথ চলতে চলতে সুব্রত শংকরকে জিজ্ঞাসা করল, নামের রেজিস্ট্রি খাতা কার কাছে থাকে শংকরবাবু?

সরকার বাবু। আমাদের বিমলবাবুর কাছে থাকে।

তিনিই তো নাম মিলিয়ে নেন?

হ্যাঁ।

তবে আগে চলুন বিমলবাবুর খোঁজটা নেওয়া যাক, তিনি হয়ত এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।

চলুন।

শীতের সকাল। পথের দু'পাশের কচি দুর্বাদলগুলির গায়ে রাতের শিশির বিন্দুগুলি সূর্যের আলোয় ঝিলমিল করছে।

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই খনির সীমানা পড়ে। ট্রাম লাইনের পাশে একটা শূন্য কয়লা গাড়ির চারদিকে একদল সাঁওতাল জটলা পাকাচ্ছে, সকলেরই মুখে একটা ভয়চকিত ভাব।

শংকরকে আসতে দেখে দলের মধ্যে একটা মৃদু গুণগুণ ধ্বনি জেগে উঠল।

কুলীদের সর্দার রতন মাঝি এগিয়ে এল।

কি খবর মাঝি? কিছু বলবি?

আমরা আর ইখানে কাম করতে লারব বাবু।

কেন রে?

ই খনিতে ভূত আছে বাবু। ভূত।

ওসব বাজে কথা, তাছাড়া কাজ ছেড়ে দিলে খাবি কি?

কিন্তুক তুরাই বল কেনে বাবু। প্রাণটি হাতে লিয়ে এমনি করে কেম্নে কাজ করি?

চন্দন সিং ও বিমলবাবু এসে হাজির হলেন।

এই যে বিমলবাবু, কাল রেজিস্ট্রী খাতা আপনি মিলিয়ে ছিলেন তো? শংকর প্রশ্ন করল।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সকলে খাদ থেকে উঠে এসেছিল working hours-য়ের পরে—মানে, যারা কাল দিনের বেলায় কয়লা কাটতে খাদে নেমেছিল তারা সকলে আবার খাদ থেকে ফিরে এসেছিল তো?

তা এসেছিল বৈকি।

তবে এইরকম দুর্ঘটনা ঘটলো কি করে? সব শুনেছেন নিশ্চয়ই। 'চানক' যে চালায় সে লোকটা কোথায়?

কে, আবদুল?

হ্যাঁ।

সে 'চানক' এর মেসিনের কাছেই আছে।

তাকে একবার ডেকে আনুন।

বিমলবাবু আবদুলকে ডাকতে চলে গেলেন।

রতন মাঝি আবার এগিয়ে এল। বাবু, আমরা কুলিকামিনরা আজ চলে যাবো রে।

তোদের কোন ভয় নেই। দুটো দিন সবুর কর, আমি সব ঠিক করে দেবো। ভূতটুত ওসব যে একদম বাজে কথা এ আমি ধরে দেবো। যা তোরা যে যার কাজে যা।

কিন্তু দেখা গেল শংকরের আশ্বাস বাক্যেও কেউ কাজে যাবার কোন গরজই দেখাচ্ছে না।

তু কি বলছিস বাবু, আমি বোঙার নামে 'কিরা' কেটে বলতে পারি এ খনিতে ভূত আছে।

এমন সময় বিমলবাবু আবদুল মিস্ত্রিকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।

আবদুলকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, গত সন্ধ্যায় সে যথারীতি আটটার মধ্যেই চানক বন্ধ করে চলে গিয়েছিল এবং যতদূর জানে খাদে আর কেউ তখন ছিল না।

'চানকের এন্‌জিনে চাবী দেওয়া থাকে না মিস্ত্রি?

জিজ্ঞাসা করল সুব্রত।

হ্যাঁ সাব্।

চাবী কার কাছে থাকে?

আজ্ঞে আমার কাছেই তো।

আচ্ছা, আজ সকালে 'চানকের' এন্‌জিনের কাছে গিয়ে এন্‌জিনে চাবী দেওয়া দেখতে পেয়েছিলে তো?

হ্যাঁ সাব্।

চলুন শংকরবাবু, খাদের যে কাঁথিতে পিলার ধ্বসে গেছে সে জায়গাটা একবার ঘুরে দেখে আসি।

বেশ চলুন। আসুন বিমলবাবু, চল চন্দন সিং।

তখন সকলে মিলে খাদের দিকে রওনা হলো।

সাত

নেকড়ার পুঁটলি

এক, দো, তিন!!!

কয়লা খাদের মুখে অন্‌সেটার ঘণ্টা বাজালে, এক, দো, তিন্।

ঠং ঠং ঠং।...ঘণ্টার অদ্ভুত আওয়াজ এক, দো, তিন্ বলবার সঙ্গে সঙ্গে গম্ গম্ ঝন্ ঝন্ করে চানকের গহ্বরের স্তরে স্তরে প্রতিধ্বনিত হলো।

পাতালপুরীর অন্ধ-গহ্বর থেকে যেন মরণের ডাক এলো, আয়! আয়! আয়!

এ যেন এক অশরীরী শব্দমুখর হাতছানি।

রেজিং বাবু রামলোচন পোদ্দার চানকের মুখে আগে এসে দাঁড়াল।

তিনটি ঘণ্টার মানে মানুষ এবারে খাদে চানকের সাহায্যে নামবে তারই সংকেত।

চানকের রেলিং ঘেরা খাঁচার মত দাঁড়াবার জায়গায় শংকর, রেজিং বাবু, সুব্রত, রতন মাঝি ও আরো দুই জন সর্দার গ্যাসল্যাম্প নিয়ে প্রবেশ করল।

অন্ধকার গহ্বর পথে ঘড় ঘড় শব্দে চানক নামতে শুরু করল।

বাইরের রৌদ্রতপ্ত পৃথিবী যেন সহসা সামনে থেকে ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেল।

উপরের সুন্দর পৃথিবী যেন খাদের এই বীভৎস অন্ধকারের সঙ্গে আড়ি করে দিয়ে দূরে সরে গেছে।

সকলে এসে খাদের মধ্যে নামল।

কঠিন স্তব্ধ অন্ধকার। কালো কয়লার দেওয়ালে দেওয়ালে যেন মিশে এক হয়ে গেছে।

মৌন আঁধারে, মধ্যে শীতটা যেন আরো জমাট বেঁধে উঠেছে। সর্দার তিনজন গ্যাসল্যাম্প হাতে এগিয়ে চলল পথ প্রদর্শক হয়ে, অন্য সকলে চলল পিছু পিছু। সম্মুখে ও আশপাশে কালো কয়লার দেওয়ালে সামান্য যেটুকু আলো গ্যাসল্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়েছে, তা ছাড়া চারিদিকে কঠিন মৌন অন্ধকার যেন কী এক ভৌতিক বিভীষিকায় হাঁ করে গিলতে আসছে।

সকলের পায়ের শব্দ অন্ধকারের বুকে শুধু যেন জীবনের একমাত্র সাড়া তুলেছে। এবং মাঝে মাঝে দু' একটা কথার টুকরো তার কাটা কাটা শব্দ।

সহসা রতন মাঝি এক জায়গায় এসে দাঁড়াল।

১৩নং কাঁথিতে যাবার মেন গ্যালারী এইটাই না হে মাঝি? প্রশ্ন করলেন বিমলবাবু।

আজ্ঞে বাবু।—

চালটা এখানে একটু খারাপ আছে না?

আজ্ঞে।

এখানে একটু সাবধানে আসবেন ম্যানেজারবাবু। এ পাশের 'লোকেশন্টার' কি ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখেছেন স্যার? শংকর নীরবে পথ চলতে লাগল। বিমলবাবুর কথার কোন জবাব দিল না।

পথের মধ্যে জল জমে আছে। সেই জল আশে পাশে দেওয়ালের গা বেয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে। জলের মধ্য দিয়ে হাঁটার দরুন জলের শপ শপ শব্দ হতে লাগল।

আরো খানিকটা এগিয়ে মাঝি একটা সরু সুড়ঙ্গ পথের সামনে দাঁড়িয়ে গেল, সামনেই গ্যাস ল্যাম্পের ম্রিয়মান আলোয় এক অপ্রশস্ত গুহাপথ যেন হাঁ করে মৃত্যু-ক্ষুধায় ওৎ পেতে আছে।

এই ১৩ নম্বর কাঁথি সাব। রতন মাঝি বললে।

হাতের গ্যাস ল্যাম্পটা আরো একটু উঁচু করে সুড়ঙ্গ পথের দিকে মাঝি পা বাড়াল, যাইয়ে সাব্।

সুড়ঙ্গ পথে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া গেল না। প্রকাণ্ড একটা কয়লার চাংড়া ধ্বসে পড়ে পথটা বন্ধ করে দিয়েছে। এবং সেই চাংড়ার তলা থেকে একটা সাঁওতাল যুবকের দেহের অর্দ্ধেকটা বের হয়ে আছে। বুক পিঠ এক হয়ে গেছে। কান ও মুখের ভিতর দিয়ে এক ঝলক রক্ত বের হয়ে এসে কালো কয়লা ঢালা পথের ওপরে কালো হয়ে জমাট বেঁধে আছে। পাশেই একটা লোহার গাঁইতি পড়ে আছে।

সকলে স্তব্ধ হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে গেল।

কারও মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই।

শুধু এক সময় শংকরের বুকখানা কাঁপিয়ে একটা বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল।

প্রথমেই কথা বললেন বিমলবাবু, Rightly served. কথাটা যেন একটা তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতই সকলের অন্তরে গিয়ে বিঁধল।

বেটারা নিশ্চয়ই চুরি করে রাত্রে কয়লা তুলতে এসেছিল। কথাটা বললেন রেজিং বাবু রামলোচন পোদ্দার।

কিন্তু কোন পথে কেমন করে ওরা এল বলুন তো? প্রশ্ন করলেন সুব্রত, 'চানকে' তো চাবী দেওয়াই ছিল।

ভূতুড়ে মশাই। সব ভূতুড়ে কাণ্ড কারখানা। বললে তো আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন না মশাই। ভূতের কখনও চাবির দরকার হয়? এখন দেখুন। চানকে চাবি দেওয়া রইল, অথচ এরা দিব্যি খাদের মধ্যে এসে ঢুকল এবং মারা গেল। বিমলবাবু বললেন।

হুঁ চলুন এবারে ফেরা যাক। আর এখানে থেকে কী হবে? চল মাঝি, শংকর বললে।

সকলে আবার ফিরে চলল। সুব্রত সকলের পিছনে চিন্তাকুল মনে অগ্রসর হলো। সহসা অন্ধকারে পায়ে কী ঠেকতে তাড়াতাড়ি নীচু হয়ে দেখতেই কী যেন অন্ধকারে পথের ওপরে হাতে ঠেকল। সুব্রত নিঃশব্দে সেটা হাতে তুলে নিয়ে আবার পথ চলতে লাগল।

বস্তুটা কাপড়ের পুঁটলি।

সুব্রত পুঁটলিটা জামার পকেটে ভরে নিল।

সকলে এসে আবার চানকের মুখে উপস্থিত হলো।

'অন্‌সেটার' আবার ঘণ্টা বাজিয়ে সকলকে চানকের সাহায্যে খাদের উপরে তুলে নিল।

সেদিনকার মত খাদের কাজ বন্ধ রাখবার আদেশ দিয়ে শংকর বাংলোয় ফিরে এল।

এক রাতের মধ্যে এতগুলো পর পর মৃত্যু শংকরকে যেন দিশেহারা করে দিয়েছে।

কী এখন সে করবে?

কোন্ পথে কাজ শুরু করবে? বাংলোয় ফিরে খনির কর্তা সুধাময় চৌধুরীর কাছে একটা জরুরী তার করে দিল।

আট

পুঁটলি রহস্য

সুব্রত এসে বাংলোয় নিজের ঘরে ঢুকল।

নানা এলোমেলো চিন্তায় সেও যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা নিছক একটা অ্যাকসিডেন্ট না অন্য কিছু। কিন্তু সবচাইতে আশ্চর্য, লোক গেল কি করে খাদের মধ্যে।

নাঃ ব্যাপারটাকে যতটা সহজ ভাবা গিয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে ঠিক ততটা নয়।

চাকরকে এককাপ গরম চা দিতে বলে শংকর ইজিচেয়ারটার ওপরে গা়টা ঢেলে দিয়ে চোখ বুঁজে চিন্তা করতে লাগল।

চিন্তা করতে করতে কখন এক সময় জাগরণ-ক্লান্ত দু'চোখের পাতায় ঘুমের ঢুলুনি নেমেছে তা ও টেরই পায়নি। ভৃত্যের ডাকে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসল।

বাবুজি, চা।

ভৃত্যের হাত থেকে ধূমায়িত চায়ের কাপটা নিয়ে সামনের একটা টি'পয়ের ওপরে সুব্রত নামিয়ে রাখল।

ভৃত্য ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

খোলা জানালা পথে রৌদ্র কলঙ্কিত শীতের সুন্দর প্রভাত। দূরে কালো পাহাড়ের অস্পষ্ট ইশারা। ওদিকে ট্রাম লাইনে পর-পর কয়খানা খালি টবগাড়ি—কয়েকটা সাঁওতাল যুবক সেখানে দাঁড়িয়ে জটলা পাকাচ্ছে। চা পান শেষ করে সুব্রত উঠে গিয়ে ঘরের দরজাটা এঁটে জামার পকেট থেকে খনির মধ্যে কুড়িয়ে পাওয়া ন্যাকড়ার ছোট্ট পুঁটলিটা বের করল।

একটা আধময়লা রুমালের ছোট পুঁটলি।

কম্পিত হস্তে সুব্রত পুঁটলিটা খুলে ফেলল।

পুঁটলিটা খুলতেই তার মধ্যকার কয়েকটা জিনিস চোখে পড়ল। একটা মাঝারি গোছের 'ডিনামাইট', একটা পলতে, একটা টর্চ!...

আশ্চর্য, এগুলো খনির মধ্যে কেমন করে গেল।

ডিনামাইট কেন?...সুব্রত ভাবতে লাগল। ডিনামাইট সাধারণতঃ খাদের মধ্যে বড় বড় কয়লার চাংড়া ধ্বসাবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সঙ্গে পলতেও একটা দেখা যাচ্ছে। এই ডিনামাইটের সঙ্গে পলতের সাহায্যে

আগুন ধরিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বড় বড় কয়লার চাংড়া ধ্বসানোর সুবিধা হয়।

টর্চ।...এটা বোধ হয় অন্ধকারে পথ দেখাবার জন্য। তবে কি কেউ গোপনে রাত্রে এই সব সরঞ্জাম নিয়ে খাদে গিয়েছিল কয়লার চাংড়া ধ্বসাতে?...নিশ্চয়ই তাই।—কিন্তু ধ্বসাতেই যদি কেউ গিয়ে থাকবে তবে, এগুলো সেখানে ফেলে এলো কেন?—তবে কি ধ্বসায়নি? না ধ্বসিয়ে চলে এসেছিল?—কিন্তু এমনও তো হতে পারে আরো 'ডিনামাইট', আরো পলতে ছিল, একটায় যদি না হাসিল হয় তবে এটার দরকার হতে পারে এই ভেবে বেশী ডিনামাইট নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? তারপর হয়ত একটাতেই কাজ হয়ে যেত, এটার আর দরকার হয়নি, তাড়াতাড়িতে এটা ফেলেই চলে এসেছে।—কিন্তু কোন্ পথ দিয়ে লোকটা খনির মধ্যে ঢুকল। ঢুকবার তো মাত্র একটিই পথ। চানকের সাহায্যে! চানকের চাবী কার কাছে থাকে? আবদুল মিস্ত্রি বললে তার কাছেই থাকে। চাবীটা এমন কোন মূল্যবান চাবী নয়, বা কোন প্রাইভেট ঘরের চাবী নয়, সামান্য চানকের চাবী।—চাবীটা রাত্রে চুরি করা এমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। এবং কাজ শেষ হয়ে যাবার পর যথাস্থানে চাবীটা আবার রেখে আসাও দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়...তাহলে দেখা যাচ্ছে ভূত নয়। মানুষেরই কাজ। কিন্তু এর সঙ্গে লোকগুলো মারা যাবার কী সম্পর্ক আছে? তবে কি।—সহসা চিন্তার সূত্র ধরে একটা কথা সুব্রতর মনের কোঠায় এসে উঁকি দিতেই, সুব্রতর মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নিশ্চয়ই তাই।—কিন্তু রুমালটা? রুমালটা কার?—সুব্রত রুমালখানি সজাগ দৃষ্টির সামনে তুলে ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করতে লাগল।

রুমালখানি আকারে ছোটই। হাতে সেলাই করা সাধারণ লংক্লথের টুকরো দিয়ে তৈরী রুমাল। রুমালে একধারে ছোট অক্ষরে লাল সূতায় ইংরাজি অক্ষর 'S', 'C'.

এক কোণে ধোপার চিহ্ন রয়েছে।...

সুব্রতর মাথার মধ্যে চিন্তাজাল জট পাকাতে লাগল। কাব রুমাল! কার রুমাল! 'S', 'C' নামের initial যার তার পুরো নাম কি হতে পারে? 'শশাঙ্ক', 'শংকর', 'শশধর', 'শরদিন্দু', 'শরৎ', 'শশি', 'শচীন', 'শৈলেশ' কিংবা 'সনৎ', 'সুকুমার', 'সমীর', 'সুধাময়'। কে! কে! কিন্তু এমনও তো হতে পারে অন্য কারো রুমাল চুরি করে আনা হয়েছিল, তবে?

...সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। যোগসূত্র এলোমেলো হয়ে কেমন যেন জট পাকিয়ে যায়। হ্যাঁ, ঠিক ঠিক...আসতেই হবে! সে আসবে! আসবে!

অবশ্যম্ভাবী একটা আশু ঘটনার সম্ভাবনায় সুব্রতর সর্বশরীর সহসা যেন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে!

সুব্রত চেয়ার ছেড়ে ওঠে, ঘরের মধ্যে পায়চারী শুরু করে দেয় দীর্ঘ পা ফেলে ফেলে।

বাইরে গোলমাল শোনা গেল।

পুলিশের লোক এসে গেছে অদূরবর্তি কাত্‌রাসগড় স্টেশন থেকে।

চঞ্চলপদে পুঁটলিটা আবার পূর্বের মত বেঁধে সুব্রত সেটা নিজের সুটকেসের মধ্যে ভরে রেখে দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এল।

দারোগাবাবু সকলের জবানবন্দী নিয়ে, ধাওড়ার লাস ময়না তদন্তের জন্য চালান দিয়ে খাদের লাসগুলো উদ্ধারের একটা আশু ব্যবস্থা করবার জন্য শংকরবাবুকে আদেশ দিয়ে চলে গেলেন।

সুব্রত যাবার সময় তার পরিচয় দিয়ে দারোগাবাবুকে অনুরোধ জানাল ঃ এখানে ইতিপূর্বে যে সব ম্যানেজারবাবু খুন হয়েছেন তাঁদের ময়না তদন্তের রিপোর্টগুলো সংক্ষেপে মোটামুটি যদি জানান তবে তার বড্ড উপকার হয়। দারোগাবাবু সুব্রতর পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত খুশী হলেন এবং যাবার সময় বলে গেলেন, নিশ্চয়ই, একথা বলতে। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে কত যে খুশী হলাম। কালই আপনাকে রিপোর্ট একটা মোটামুটি সংগ্রহ করে লিখে পাঠাব।

সুব্রত বললে, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। পুলিশের লোক হয়েও যে আপনি এত উদার, সত্যই আশ্চর্যের বিষয়। কিরীটী যদি এখানে আসে তবে নিশ্চয়ই আপনার কাছে সংবাদ পাঠাবো। এসে আলাপ করবেন। আচ্ছা নমস্কার।

নয়

আঁধার রাতের পাগল

সুব্রত শংকরবাবুর সঙ্গে গোপন পরামর্শ করে অলক্ষ্যে চানকের ওপরে দু'জন সাঁওতালকে সর্বক্ষণ পাহারা দেবার জন্য নিযুক্ত করল।

বিকালের দিকে সুধাময়বাবুর সেক্রেটারী কলকাতা থেকে তার করে জবাব দিলেন ঃ কর্তা বর্তমানে কলকাতায় নেই। তিনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন। কর্তা কলকাতায় ফিরে এলেই তাঁকে সংবাদ দেওয়া হবে। তবে কর্তার হুকুম আছে কোন কারণেই যেন, যত গুরুতরই হোক খনির কাজ না বন্ধ রাখা হয়।

রাতে শংকর সুব্রতকে জিজ্ঞাসা করল, কী করা যায় বলুন, সুব্রতবাবু। কাল থেকে তা হলে আবার খনির কাজ শুরু করে দিই?

হ্যাঁ দিন। দু'চার দিনের মধ্যে আমার তো মনে হয় আর খুনটুন হবে না।

শংকর হাসতে হাসতে বললে, আপনি গুণতে পারেন নাকি সুব্রতবাবু?

না, গুণতে ফুনতে জানি না মশাই। তবে চারিদিককার হাবভাব দেখে যা মনে হচ্ছে তাই বলছি মাত্র। বলতে পারেন স্রেফ অনুমান।

যাহোক, শংকর খনির কাজ আবার পরদিন থেকে শুরু করাই ঠিক করলে এবং বিমলবাবুকে ডেকে যাতে আগামী কাল ঠিক সময় থেকেই নিত্যকার মত খনির কাজ শুরু হয় সেই আদেশ দিয়ে দিল।

বিমলবাবু কাঁচুমাচু ভাবে বললে, আবার ঐ ভূতপ্রেতগুলোকে চটাবেন স্যার। আমি আপনার most obedient servant, যা order দেবেন, with life তাই করবো। তবে আমার মতে এ খনির কাজ চিরদিনের মতো একেবারে বন্ধ করে দেওয়াই কিন্তু ভাল ছিল স্যার। ভূতপ্রেতের ব্যাপার। কখন কি ঘটে যায়।

শংকর হাসতে হাসতে উত্তর দিল, ভূতেরও 'ওঝা' আছে বিমলবাবু। অতএব মা ভৈষী। এখন যান সব ব্যবস্থা করুনগে যাতে কাল থেকে আবার কাজ শুরু করতে পারে।

কিন্তু স্যার।

যান যান রাত্রি হয়েছে। সারারাত কাল ঘুমুতে পারিনি।

বেশ। তবে তাই হবে। আমার আর কী বলুন? আমি আপনাদের most obedient and humble servant বইত নয়।

বিমলবাবু চলে গেলেন।

বাইরে শীতের সন্ধ্যা আসন্ন হয়ে এসেছে। সুব্রত কোমরে রিভলভারটা

গুঁজে গায়ে একটা কালো রঙের ফারের ওভারকোট চাপিয়ে পকেটে একটা টর্চ নিয়ে বাংলোর বাইরে এসে দাঁড়াল।

পায়ে চলা লাল সুরকির রাস্তাটা কয়লা গুঁড়োয় কালচে হয়ে ধাওড়ার দিকে বরাবর চলে গেছে।

সুব্রত এগিয়ে চলে, পথের দু পাশে অন্ধকারের মধ্যে বড় বড় শাল ও মহুয়ার গাছগুলো প্রেতমূর্তির মত নিঝুম হয়ে যেন শিকারের আশায় দাঁড়িয়ে আছে। পাতায় পাতায় জোনাকির আলো, জ্বলে আর নিভে, নিভে আর জ্বলে। গাছের পাতা দুলিয়ে দূর প্রান্তর থেকে শীতের হিমের হাওয়া হিল্ হিল্ করে বহে যায়।

সর্বাঙ্গ শির শির করে ওঠে।

কোথায় একটা কুকুর শীতের রাত্রির স্তব্ধতা ছিন্ন ভিন্ন করে মাঝে মাঝে ডেকে ওঠে।

সুব্রত এগিয়ে চলে।

অদূরে পাঁচ নম্বর কুলি-ধাওড়ার সামনে সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীরা একটা কয়লার অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে চারিদিকে গোলাকার হয়ে ঘিরে বসে কী সব শলা পরামর্শ করছে। আগুনের লাল আভা সাঁওতাল পুরুষগুলোর খোদাই করা কালো পাথরের মত দেহের ওপরে প্রতিফলিত হয়ে দানবীয় বিভীষিকায় যেন রূপায়িত হয়ে উঠেছে।

তারও ওদিকে একটা বহু পুরাতন নীল-কুঠির ভগ্নাবশেষ শীতের ধুম্রাচ্ছন্ন অন্ধকারে কেমন ভৌতিক ছায়ার মতই অস্পষ্ট মনে হয়।

চারিদিকে বোয়ান গাছের জঙ্গল, তারই পাশ দিয়ে শীর্ণকায় একটি পাহাড়ী ক্ষুদ্র নদী, তার শুষ্কপ্রায় শুভ্র বালু-রাশির উপর দিয়ে একটুখানি নির্মল জলপ্রবাহ শীতের অন্ধকার রাতে এঁকে বেঁকে আপন খেয়াল খুশিতে অদূরবর্তী পলাশ বনের ভিতর দিয়ে ঝির ঝির করে কোথায় বহে চলেছে কে জানে?

পলাশ বনের উত্তর দিকে ৬ ও ৭ নম্বর কুলি ধাওড়া। সেখান থেকে মাদল ও বাঁশীর আওয়াজ শোনা যায়।

সহসা অদূরবর্তী মহুয়া গাছগুলির তলায় ঝরা পাতার ওপরে একটা যেন সজাগ সতর্ক পায়ে চলার খস্-স্ শব্দ পেয়ে সুব্রত থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল।

বুকের ভিতরকার হৃদপিণ্ডটা যেন সহসা প্রবল এক ধাক্কা খেয়ে থম্‌কে থেমে গেল।

পকেটে হাত দিয়ে সুব্রত টর্চটা টেনে বের করল।

যে দিক থেকে শব্দটা আসছিল ফস্ করে সেই দিকে আলোটা ধরেই বোতাম টিপে দিল।

অন্ধকারের বুকে টর্চের উজ্জ্বল আলোর রক্তিম আভা মুহূর্তে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে অট্টহাসি হেসে ওঠে।

কিন্তু ও কে?...অন্ধকারে পলাশ গাছগুলোর তলায় বসে অন্ধকারে কী যেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে খুঁজছে।

আশ্চর্য।

এই অন্ধকারে। পলাশ বনের মধ্যে অমন করে লোকটা কী খুঁজছে?

সুব্রত এগিয়ে গেল।

লোকটা বোধ করি পাগল হবে।

এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া এলোমেলো বিস্রস্ত জট পাকান চুল। মুখ, ধুলো বালিতে ময়লা হয়ে গেছে এবং মুখে বিশ্রী দাড়ি। গায়ে একটা বহু পুরাতন ওভারকোট; শতছিন্ন ও শত জায়গায় তালি দেওয়া। পিঠে একটা ন্যাক্ড়ার ঝুলি, পরনেও একটা মলিন প্যান্ট।

সুব্রত টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে লোকটার দিকে এগিয়ে যায়।

এই, তুই কে রে? সুব্রত জিজ্ঞাসা করে।

কিন্তু লোকটা কোন জবাবই দেয় না সুব্রতর কথায়; শুক্নো ঝরে পড়া শালপাতাগুলো একটা ছোট লাঠির সাহায্যে সরাতে সরাতে কী যেন আপন মনে খুঁজে বেড়ায়।

এই তুই কে?

সুব্রত টর্চের আলোটা লোকটার মুখের উপর ফেলে। সহসা লোকটা চোখ দুটো বুজিয়ে চক্চকে্ দু'পাটি দাঁত বের করে হি হি করে হাসতে শুরু করল।

লোকটা কেবল হাসে।

হাসি যেন আর থামতেই চায় না। হাসছে তো হাসছেই। সুব্রতও সেই হাসিভরা মুখটার ওপরে আলো ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে নিতান্ত বোকার মতই চুপ করে।

সুব্রত আলোটা নিভিয়ে দিল।

সহসা লোকটা ভাঙ্গা গলায় বলে ওঠে, তু কি চাস্ বটে রে বাবু!

সুব্রত বোঝে লোকটা সাঁওতাল, বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে।

তোর নাম কি? কোথায় থাকিস্?

আমার নাম রাজা বটে!....থাকি উই—যেথা মারাংবরু রঁইছে।

এখানে এই অন্ধকারে কি করছিস?

তাতে তুর দরকারডা কী? যা ভাগ্।

সুব্রত দেখলে সরে পড়াই ভাল। পাগল। বলা তো যায় না। সুব্রত সেখান থেকে চলে এল।

পলাশ বন ছাড়ালেই ৬ নং কুলীর ধাওড়া।

রতন মাঝি সেখানেই থাকে।

পলাশ ও শালবনের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় কুলিধাওড়ার সামনে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের লাল রক্ত আভাস।

মাদলের শব্দ কানে এসে বাজে, ধিতাং! ধিতাং!

সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীতে সাঁওতালী সুর।

সারাদিন খাদে ছুটি গেছে, সব আনন্দ উৎসবে মত্ত হয়ে উঠেছে।

ধাওড়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই একটা কালো কুকুর ঘেউ-উ-উ করে ডাকতে ডাকতে তেড়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি সাঁওতাল যুবক এগিয়ে এল, কে বটে রে? আঁধারে ঠাওর করতে লারছি। রা করিস না কেনে?

রতন মাঝি আছে? সুব্রত কথা বলে।

আরে বাবু। ও পিন্টু, বাবুকে বসবার জায়গা দে। বসেন আইজ্ঞা। রতন মাঝি সুব্রতর সামনে এগিয়ে আসে।

আধো আলো আধো আঁধারে মাঝির পেশল কালো দেহটা একটা যেন প্রেতের মতই মনে হয়।

কিছু সংবাদ আছে মাঝি?

না বাবু। সারাটি দিনমানই রইলাম বটে।

সুব্রত আরো কিছুক্ষণ রতন মাঝির সঙ্গে দু'চারটা আবশ্যকীয় কথা বলে ফিরল।

দশ

অদৃশ্য আততায়ী

সেই আগেকার পথ ধরেই সুব্রত আবার ফিরে চলেছে। আকাশে কাস্তের মত সরু এক ফালি চাঁদ জেগেছে; তারই ক্ষীণ জ্যোৎস্না শীতার্ত ধরণীর ওপরে যেন স্বপ্নের মতই একটা আলোক ওড়না বিছিয়ে দিয়েছে। পলাশ ও মহুয়া বনে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে টুক্‌রো টুক্‌রো চাঁদের আলোর আলপনা। বনপথে যেন আলোর আলপনা ঢাকাই বুটি বুনে দিয়েছে। মাদল ও বাঁশীর শব্দ তখনও শোনা যায়।

সুব্রত অন্যমনস্ক ভাবেই ধীরে ধীরে পথ চলছিল, সহসা সোঁ করে কানের পাশে একটা তীব্র শব্দ জেগে উঠেই মিলিয়ে গেল। পরক্ষণেই স্তব্ধ আলোছায়া ঘেরা বনতল প্রকম্পিত করে বন্দুকের আওয়াজ জেগে উঠল ঃ গুড়ুম।...এবং সঙ্গে সঙ্গে কার যেন আর্ত চীৎকার কানে এল। সুব্রত থম্‌কে হতচকিত হয়ে থেমে গেল।

প্রথমটায় সে এতখানি বিচলিত ও বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল যে ব্যাপারটা যেন ভাল করে কোন কিছু বুঝে উঠতেই পারে নি। পরক্ষণেই নিজেকে নিজে সামলে নিয়ে, কোমরবন্ধে লোডেড রিভলভারটা ডান হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে যে দিক থেকে গুলির আওয়াজ শোনা গিয়েছিল সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল। কিছু দেখা যায় না বটে তবে শুকনো পাতার ওপরে একটা ঝটাপটির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সুব্রত রিভলভারটা মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে টর্চটা জ্বালল এবং টর্চের আলো ফেলে সন্তর্পণে এগিয়ে গেল, শব্দটা যে দিক থেকে আসছিল সেই দিকে।

অল্প খুঁজতেই সুব্রত দেখলে একটা পলাশ গাছের তলায় কে একটা লোক রক্তাক্ত অবস্থায় ছট্‌ফট্‌ করছে।

সুব্রত লোকটার গায়ে আলো ফেললে।

লোকটা একজন সাঁওতাল যুবক।

লোকটার ডানদিকের পাঁজরে গুলি লেগেছে।

তাজা লাল টক্‌টকে রক্তে বনতলের মাটির অনেকটা সিক্ত হয়ে উঠেছে।

লোকটার পাশেই একটা সাঁওতালী ধনুক ও কতকগুলো তীর পড়ে আছে।

সুব্রত লোকটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। কিন্তু সাঁওতালটাকে চিনতে পারল না।

লোকটা ততক্ষণে নিস্তেজ হয়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দু'একবার ক্ষীণ অস্ফুট স্বরে কী যেন বিড় বিড় করে বলতে বলতে হতভাগ্য শেষ নিশ্বাস নিল।

সুব্রত নেড়ে চেড়ে দেখলে, শেষ হয়ে গেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস সুব্রতর বুকখানাকে কাঁপিয়ে বের হয়ে গেল।

সে উঠে দাঁড়াল। টর্চের আলো ফেলে ফেলে আশে পাশের বন ও ঝোপ ঝাড় দেখলে, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না।

হতভাগা সাঁওতালটা বন্দুকের গুলি খেয়ে মরেছে এবং স্বকর্ণে সে বন্দুকের গুলির আওয়াজও শুনতে পেয়েছে।

কিন্তু কে মারলে? কেনই বা মারলে?

নানাবিধ প্রশ্ন সুব্রতর মাথার মধ্যে জট পাকাতে লাগল। কিন্তু এটা ঠিক, যেই মেরে থাক সে সশস্ত্র।

অন্ধকার বনপথে সুব্রতর কাছে লোডেড রিভলভার থাকলেও সে একা। তার উপর এখানকার পথ ঘাট তার তেমন ভাল চেনা নয়। অলক্ষ্যে বিপদ আসতে কতক্ষণ? আর বিপদ যদি আচম্‌কা অন্ধকার আশপাশ থেকে এসেই পড়ে তবে তাকে ঠেকানও যাবে না। অথচ এত বড় একটা দায়িত্ব মাথায় নিয়ে এমনি করে বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকাটাও সমীচীন নয়। অতএব এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সরে পড়া যায় ততই মঙ্গল।

সুব্রত সজাগ হয়ে উঠল।

টর্চের আলো জ্বেলে সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখতে দেখতে সে এগিয়ে চলল।

কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

কেবলই একজনের পর একজন খুন হচ্ছে। কারা এমনি করে নৃশংসভাবে মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।

কিসের প্রয়োজনেই বা এমনি ভয়ঙ্কর খেলা? কিন্তু পথ চলতে একটু আগে যে সোঁ করে শব্দটাকে সে কানের পাশে শুনেছিল সেটাই বা কিসের শব্দ?

কিসের শব্দ হতে পারে?

নানা রকম ভাবতে ভাবতে সুব্রত অন্ধকার শালবনের পথ ধরে যেন বেশ একটু দ্রুত পদেই অগ্রসর হতে থাকে।

রাত্রি কটা বেজেছে কে জানে?

আসবার সময় তাড়াতাড়িতে হাত-ঘড়িটা পর্যন্ত আনতে মনে নেই।

খানিকটা দ্রুত হেঁটে শালবন পেরিয়ে সুব্রত পাহাড়ী নদীটার ধারে এসে দাঁড়াল।

মাথার উপরে আকাশের বুকে ক্ষীণ চাঁদের আলোয় যেন একটা সূক্ষ্ম রূপালি পর্দা থির থির করে কাঁপছে। কোথাও কুয়াশার লেশ মাত্র নাই। দূরে সাঁওতাল ধাওড়া থেকে একটানা একটা কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে।

শীতের পাহাড়ী নদী, একেবারে জল নেই বললেই হয়। অনেকটা পর্যন্ত শুধু বালি আর বালি। নদীটা হেঁটেই সুব্রত পার হয়ে গেল।

সামনেই একটা প্রান্তর।

প্রান্তর অতিক্রম করে সুব্রত চলতে লাগল।

আনমনে চিন্তা করতে করতে কতটা পথ সুব্রত এগিয়ে এসেছে তা টের পায়নি; সহসা অদূরে আবছা চাঁদের আলোয় প্রান্তরের মাঝখানে দৃষ্টি পড়তেই সুব্রত থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল।

এখানে আসবার পরের দিন সন্ধ্যার দিকে প্রান্তরের মাঝে বেড়াতে বেড়াতে যে ভয়ঙ্কর মূর্তিটা দেখেছিল অবিকল সেই মূর্তিটাই যেন লম্বা লম্বা পা ফেলে ফেলে জনহীন মৃদু চন্দ্রালোকে প্রান্তরের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছে।

সুব্রত ক্ষণেক দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবল, তারপরই কোমরের 'লেদার কেস' থেকে অটোমেটিক রিভলভারটা বের করে অদূরের সেই চলমান মূর্তিটাকে লক্ষ্য করে রিভলভারের ট্রিগার টিপ্‌ল।

নির্জন প্রান্তরের অন্ধকারে একঝলক আগুনের শিখা উদ্‌গিরণ করে চারিদিকে ছড়িয়ে একটা আওয়াজ ওঠে—গুড়ুম।

সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তরকে ভয়চকিত করে ক্ষুধিত শার্দুলের ভয়ঙ্কর ডাক শোনা গেল। পর পর তিন বার।

চম্‌কে উঠতেই সুব্রত চকিতের জন্য চোখের পাতা দুটো বুজিয়ে ফেলেছিল; কিন্তু পরক্ষণেই যখন চোখের পাতা খুলল, দেখল দ্রুত হাওয়ার মতোই সেই মূর্তি ক্রমে দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

মূর্তিটিকে যে জায়গায় দেখা গিয়েছিল সেই দিকে লক্ষ্য করে সুব্রত রিভলভারটা হাতে নিয়ে দৌড়াল।

আন্দাজমত জায়গায় এসে পৌঁছে সুব্রত টর্চটা জ্বেলে চারিদিকের মাটি ভাল করে লক্ষ্য করে দেখতে লাগল।

সহসা ও লক্ষ্য করলে প্রান্তরের শুকনো মাটির ওপরে তাজা রক্তের কয়েকটা ফোঁটা ইতস্তত দেখা যাচ্ছে।

রক্ত! তাজা রক্তের ফোঁটা!

তাহলে সত্যিই ভূত নয়, দৈত্য দানব বা পিশাচ নয়। সামান্য রক্ত মাংসের দেহধারী মানুষ। কিন্তু জখম হয়নি। সামান্য আঘাত লেগেছে মাত্র। কিন্তু পালাবে কোথায়?

এই যে মাটির ওপরে রক্তের ফোঁটা ফেলে গেল এইটাই তার নিশানা দেবে। যেখানে যতদুর পালাক না কেন হাওয়ায় উবে যেতে পারবে না।

একদিন না একদিন ধরা দিতেই হবে। কেননা আঘাত যত সামান্য হোক না কেন, আহত হয়েছে এ অবধারিত; এবং সেই জন্যই বেশী দূর পালান সম্ভব হবে না।

কিন্তু শার্দুলের ডাক!

ব্যাপারটা কী?

অবিকল শার্দুলের ডাক।

সহসা সোঁ-সাৎ করে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ সুব্রতর কানের পাশে দিয়ে যেন বিদ্যুতের মত চকিতে মিলিয়ে গেল।

সুব্রত চমকে উঠে এক লাফে সরে দাঁড়াল। এবং সরে দাঁড়াতে গিয়েই পাশে অদূরে মাটির দিকে নজর পড়ল। একটা ছোট তীরের ফলা অর্ধেক মাটির বুকে প্রোথিত হয়ে থির থির করে কাঁপছে।

সুব্রত নীচু হয়ে হাত দিয়ে তীরটা ধরে একটান দিয়ে মাটির বুক থেকে তুলে নিল।

তীরের তীক্ষ্ণ চেপ্‌টা অগ্রভাগে মাটি জড়িয়ে গেছে। এতক্ষণে সুব্রত বুঝতে পারলে একটু আগে শালবনের মধ্যে অতর্কিতে যে শব্দ শুনেছিল সেও একটা তীর ছোটারই শব্দ এবং সেই তীরটাও তাকে মারবার জন্যই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল বুঝতে আর কষ্ট হয় না।

শত্রুপক্ষ তাহলে সুব্রতর ওপরে বিশেষ নজর রেখেছে এবং তাকে মারবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তীরটা হাতে নিয়ে সুব্রত সটান বাংলোর দিকে পা চালিয়ে দিল।

সুব্রত এসে বাংলোয় যখন প্রবেশ করল, শংকর তখন ঘরে টেবিলের ওপরে এক রাশ কাগজপত্র ছড়িয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কী যেন দেখছে!

শংকর বাবু! সুব্রত ঘরের মধ্যে পা দিয়ে ডাকল।

কে?...ও, সুব্রত বাবু? এত রাত করে, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ—

একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম ঐ নদীর দিকটায়।

সামনেই একটা বেতের চেয়ারে বসে পড়ে, সুব্রত পা দুটো টান করতে করতে বললে।.

এতক্ষণ এই অন্ধকারে সেখানেই ছিলাম?

হ্যাঁ—

কথাটা বলে সুব্রত হাতের তীরটা টেবিল ল্যাম্পের অত্যুজ্জ্বল আলোর সামনে উঁচু করে তুলে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে লাগল।

সুব্রতর হাতে তীরটা দেখে শংকর সবিস্ময়ে বললে, ওটা আবার কী? কোথায় পেলেন?

সুব্রত তীরটা গভীর মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করতে করতেই মৃদু স্বরে জবাব দিল, মাঠের মধ্যে কুড়িয়ে পেলাম।

মাঠের মধ্যে তীর কুড়িয়ে পেলেন? তার মানে?

শংকর বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করল।

মানে আবার কী? কেন মাঠের মধ্যে একটা তীর কুড়িয়ে পেতে নেই নাকি?

শংকর এবারে হেসে ফেলল, তা তো আমি বলছি না; আসল ব্যাপারটা কী তাই জিজ্ঞাসা করলাম।

আমার কী মনে হয় জানেন? সুব্রত বললে শংকরের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ।

কী?

এই তীরের ফলায় নিশ্চয়ই কোন তীব্র বিষ মাখান আছে এবং সে বিষ সাধারণ কোন সুস্থ মানুষের শরীরের রক্তে প্রবেশ করলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু অবধারিত।

কি বলছেন সুব্রতবাবু?

শংকর জিজ্ঞাসু সুব্রতর মুখের দিকে তাকাল।

মনে হওয়ার কারণ আছে শংকরবাবু। সুব্রত গম্ভীর স্বরে বললে।

বুঝতে পারছি না ঠিক আপনার কথা সুব্রত বাবু—

কোন এক হতভাগ্যের উদ্দেশে এই বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করে তার জীবনের ওপরে attempt করা হয়েছিল।

সর্বনাশ বলেন কী?

হ্যাঁ, কিন্তু তার আগে অর্থাৎ বিস্তারিত ভাবে আপনাকে সব কিছু বলবার আগে এক কাপ চা—দীর্ঘ পথ হেঁটে গলাটা শুকিয়ে গেছে।

O! Surely! এক্ষুনি। বলতে বলতে শংকর সামনের টেবিলের ওপরে রক্ষিত কলিং বেল টিপ্‌ল।

ভৃত্য এসে খোলা দরজার ওপরে দাঁড়াল। সাহেব আমাকে ডাকছেন?

এই শীগ্‌গির সুব্রতবাবুকে এক কাপ গরম চা এনে দে।

আনছি সাহেব। ভৃত্য চলে গেল।

ভৃত্যকে চায়ের আদেশ দিয়ে সুব্রতর দিকে তাকিয়ে শংকর দেখলে, চেয়ারের ওপরে হেলান দিয়ে চোখ বুজে সুব্রত গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছে।

এগার

ময়না তদন্তের রিপোর্ট

টেবিলের ওপর সুব্রতর আনীত তীরটা পড়েছিল। শঙ্কর সেটা টেবিলের উপর থেকে হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়ে দেখতে লাগল।

তীরটা ছুঁড়ে কোন এক হতভাগ্যের life-এর ওপর নাকি attempt করা হয়েছিল। কে attempt করল? কার life-এর ওপরেই বা attempt করল? কেনই বা attempt করল? আশ্চর্য!

সহসা একসময় সুব্রত চোখ খুলে সামনের দিকে তাকিয়ে শংকরের হাতে তীরটা দেখতে পেয়ে চম্‌কে বলে উঠলো, আরে সর্বনাশ! করছেন কী? তারপর কি একটা বিপরীত কাণ্ড ঘটিয়ে বসবেন। রাখুন, রাখুন, তীরটা রেখে দিন। কে জানে কী ভয়ঙ্কর বিষ তীরের ফলায় মাখান আছে।

শংকর একপ্রকার থতমত খেয়ে তীরটা টেবিলের ওপরে নামিয়ে রাখল।

এমন সময় ভৃত্য গরম চায়ের কাপ হাতে ঘরে ঢুকে কাপটা টেবিলের ওপরে সুব্রতর সামনে নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে কক্ষ থেকে বের হয়ে গেল। সুব্রত ধূমায়িত চায়ের কাপটা তুলে চুমুক দিল।

আঃ। একটা আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে সুব্রত শংকরের মুখের দিকে তাকাল, ওই যে তীরটা দেখছেন শংকরবাবু, একটু আগে কোন এক অদৃশ্য আততায়ী ওটা ছুঁড়ে আমাকে ভবপারাবারে পাঠাতে চেয়েছিল।

বলেন কি? শংকর চম্‌কে উঠল।

আর বলি কি? খুব বরাত এ যাত্রায় বেঁচে যাওয়া গেছে। শুধু এক বার নয়, দু'বার তীর ছুঁড়ে আমার জীবন সংশয় ঘটানর সাধু প্রচেষ্টা করেছিল।

তারপর?

আতঙ্কে শংকরের সর্বশরীর তখন রোমাঞ্চিত।

তারপর আর কী? দু'টোর একটা attempt ও successful হয় নি—প্রমাণ এখনও শ্রীমান সুব্রত রায় আপনার চোখের সামনেই স্ব-শরীরে বর্তমান।

তা যেন হলো—কিন্তু এ যে ব্যাপার ভয়ানক দাঁড়াচ্ছে ক্রমে সুব্রতবাবু। শেষকালে কি এলোপাথাড়ি হাতের সামনে যাকে পাবে তাকেই মারবে।

মারতে পারুক ছাই না পারুক সাধু প্রচেষ্টার অভাব যে হবে না, একথা কিন্তু হলফ করে বলতে পারি মিঃ সেন। সুব্রত বললে।

কিন্তু এ ভাবে একদল ভয়ঙ্কর অদৃশ্য খুনেদের সঙ্গে কারবার করাও তো বিপজ্জনক। মুখোমুখী এসে দাঁড়ালেও না হয় এদের শক্তি পরীক্ষা করা যেতো কিন্তু এ গরিলা যুদ্ধের মত।

মেঘনাদ যিনি তিনি হয়ত সামনা সামনি দাঁড়িয়েই কল টিপছেন; আর কতকগুলো পুতুলকে কোমরে দড়ি বেঁধে যখন যেমন যে দিকে নাচাচ্ছেন তেমনি নাচছে; সুব্রত বলে।

কিন্তু মেঘনাদটি কে? শঙ্কর সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে।

আরে মশাই সেটাই যদি জানা যাবে তবে এত হাঙ্গামাই বা আমাদের পোহাতে হবে কেন? সুব্রত হাসতে হাসতে জবাব দিল।

তারপর সহসা হাসি থামিয়ে যথা সম্ভব গম্ভীর হয়ে সুব্রত বললে, আজ আবার একটি হতভাগ্য প্রাণ নিতে এসে প্রাণ দিয়েছে।

সে কি।...

হ্যাঁ। বেচারা আমাকে মারতে এসে নিজে প্রাণ দিয়েছে; সুব্রত বললে।

বলেন কী? ... তা কেমন করে জানলেন?

হতভাগ্যের মৃতদেহ এখনও শালবনের মধ্যে পড়ে আছে।

পুলিশে একটা খবর দেওয়া তো দরকার। শংকর বললে।

তা দরকার বই কি। পুলিশ জাতটা বড় সুবিধার নয়। আগে থেকে সংবাদ একটা দিয়ে রাখাই আমার মতে ভাল; কেননা 'নয়' কে 'হয়' ও 'হয়' কে 'নয়' করতে তাদের জোড়া আর কেউ নেই।

কিন্তু এত রাত্রে কাকে থানায় পাঠান যায় বলুন তো? Bus তো সেই রাত্রে দেড়টায়। ... ধারে কাছে তো থানা নেই? সেই একদম কাত্‌রাসগড়, নয় তেঁতুলিয়া হল্টে।—তা ছাড়া ব্যাপার ক্রমে যা দাঁড়াচ্ছে, কোন চেষ্টাকেই যেন আর বিশ্বাস করা যায় না।

কিন্তু থানায় লোক পাঠাতে আর হলো না; ভৃত্য এসে সংবাদ দিলে থানার দারোগাবাবুর কাছ থেকে একজন লোক এসেছে; সুব্রতবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আমার সঙ্গে? সুব্রত উঠে দাঁড়াল।

বাইরে এসে দেখলে, একজন চৌকিদার অপেক্ষা করছে।

তুমি? সুব্রত প্রশ্ন করলে।

আজ্ঞে, দারোগাবাবু আপনার নামে একটা চিঠি দিয়েছেন।

একটা মোটা মুখবন্ধ On His Majesty's Service খাম লোকটা সুব্রতর দিকে এগিয়ে ধরল।

সুব্রত খামটা হাতে করে ঘরে ঢুকতেই শংকর বললে, কী ব্যাপার সুব্রতবাবু?

দারোগাবাবু একটা চিঠি পাঠিয়েছেন। ভাল কথা, দেখুন তো লোকটা চলে গেল নাকি?

কেন?

তাড়াতাড়ি চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করুন।

এই ঝুমন। শংকর ডাকল।

বাবু। ... ঝুমন দরজার ওপরে এসে দাঁড়াল।

চৌকিদারটা কি চলে গেছে?

আজ্ঞে না। চুটিয়া খাচ্ছে।

তাকে একটু দাঁড়াতে বল।

ঝুমন চলে গেল।

ব্যাপার কী? ... শংকর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুব্রতর মুখের দিকে তাকাল।

এই লোকটার হাতেই দারোগাবাবুকে শাল-বনের খুন সম্পর্কে একটা খবর দিয়ে দিন না। তা হলে আর লোক পাঠাতে হয় না।

ঠিক বলেছেন।

শংকর তাড়াতাড়ি একটা চিঠির কাগজে সংক্ষেপে শালবনের খুন সম্পর্কে যতটা সুব্রতর কাছে শুনেছিল লিখে চৌকিদারের হাতে দিয়ে দিল দারোগাবাবুকে গিয়ে দেবার জন্য।

চৌকিদার চলে গেল।

সুব্রত খামটা খুলে দেখলে গোটা তিন-চার পুলিশ মর্গের রিপোর্ট ও তার সঙ্গে ছোট্ট একটা চিরকুট।

সুব্রতবাবু।

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাঠালাম। কাজ হয়ে গেলে যত তাড়াতাড়ি পারেন ফেরত দিলে সুখী হবো। আর দয়া করে কিরীটীবাবু এলে একটা সংবাদ দেবেন। কতদূর এগুলো? নমস্কার।

কিসের চিঠি সুব্রতবাবু? শংকর প্রশ্ন করল।

এখানে ইতিপূর্বে যে সব ম্যানেজার মারা গেছেন তাঁদের ময়না তদন্তের রির্পোট।

ঠাকুর এসে বললে, খাবার প্রস্তুত।

দু'জন উঠে পড়ল।

খাওয়া দাওয়ার পর, সুব্রত মাথার ধারে একটা টুলের ওপরে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে কম্বলে গা ঢেকে শুয়ে পড়ল।

তারপর আলোর সামনে রিপোর্টগুলো খুলে এক এক করে পড়তে লাগল।

মৃত্যুর কারণ প্রত্যেকেরই এক; প্রত্যেকেরই শরীর তীব্র বিষের ক্রিয়ায় রক্ত জমাট বেঁধে মৃত্যু হয়েছে এবং প্রত্যেকেরই গলার পিছন দিকে যে ক্ষত পাওয়া গেছে, সেখানকার 'টিসু' পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সেখানকার টিসুতেও সেই বিষ ছিল। সিভিল সার্জেনের মতে সেই ক্ষতই বিষ প্রবেশের পথ। ... তা হলে বোঝা যাচ্ছে ময়না তদন্তের রিপোর্ট থেকে যে, নিছক গলা টিপেই খুনগুলো করা হয়নি। ময়না তদন্তের রিপোর্টের সঙ্গে Chemical Examiner দের কোন report নেই। তাহলে জানা যেত কী ধরনের বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল। তবে এটুকু বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়, বিষ অত্যন্ত তীব্র শ্রেণির।

কিন্তু প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির গলার পিছন দিকে যে চারটি করে কালো কালো ছিদ্র বা ক্ষত পাওয়া গেছে সেগুলোর তাৎপর্য কী? কী ভাবে সেগুলো হলো? কেনই বা হলো? সুব্রত চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ল।

বার

আরো বিস্ময়

এক সময় সুব্রতর মনে হলো, এমনও তো হতে পারে কোন একটা গভীর উদ্দেশ্য নিয়ে এইভাবে পরপর খুন করা হচ্ছে। কিন্তু তা হলেই বা সে উদ্দেশ্যটা কী?

সুব্রত চিঠির কাগজের প্যাড্‌টা টেনে নিয়ে কিরীটীকে চিঠি লিখতে বসল।

কিরীটী।

গত কালকের সমস্ত সংবাদ দিয়ে তোকে একখানা চিঠি দিয়েছি।

ভেবেছিলাম আজ আর বুঝি তোকে চিঠি দেওয়ার মত কোন প্রয়োজনই থাকবে না; কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কতকগুলো ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়া আমার একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আজ আবার অতর্কিতভাবে এক হতভাগ্য সাঁওতাল কুলী আমাকে খুন করতে এসে নিজে অদৃশ্য এক আততায়ীর হস্তে প্রাণ দিয়েছে।

এই শত্রুর দেশে কে আমার এমন বন্ধু আছেন বুঝলাম না যিনি অলক্ষ্যে থেকে এভাবে আমার প্রাণ বাঁচিয়ে গেলেন।

এ ব্যাপারটার যে explanation আমি আমার মনে মনে খাড়া করেছি, আসলে হয়ত মোটেই তা নাও হতে পারে; হয়ত এটা আগাগোড়াই সবটা আমার উর্বর মস্তিষ্কের নিছক একটা অনুমান মাত্র। কিম্বা হয়ত এমনও হতে পারে তাদেরই দলের কেউ তার উপরে হিংসা পোষণ করে বা অন্য কোন গূঢ় কারণ বশতঃ তাকে খুন করে গেছে অলক্ষ্যে থেকে। তবে ময়না তদন্তের একটা রিপোর্ট আজ কিছুক্ষণ আগে দারোগাবাবু দয়া করে আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাতে দেখলাম, হতভাগ্য ম্যানেজারদের মৃত্যুর কারণ 'বিষ'।...

মাইনের মধ্যকার ব্যাপারটা এখনও জানা যায় নি। তবে রিপোর্ট দেখে মনে হয় দশজনই খুন হয়েছে।

বুঝতে পারি না এরকম নৃশংসভাবে একটার পর একটা খুন করে কী লাভ থাকতে পারে খুনীর। আর ম্যানেজারগুলো তো তৃতীয় পক্ষ। তাদের নিজস্ব কী এমন interest খনি সম্পর্কে থাকতে পারে যাতে করে তাদের এভাবে খুন হওয়ার ব্যাপারটাকে explain করা যেতে পারে।

তবে কী আসল ব্যাপারটা আগাগোড়াই একটা 'হুম্‌কি' বা 'চাল'?

যা হোক এখন পর্যন্ত তোর বন্ধুটি নির্বিঘ্নে সুস্থে ও বহাল তবিয়তে খোস মেজাজেই আছেন। খবর কী? রাজুর খবর কী? মা কেমন আছেন?

তোদের সুব্রত।

পরদিন সকালে সুব্রতর যখন ঘুম ভাঙ্গল, চারিদিকে একটা ঘন কুয়াশার যবনিকা দুলছে।

শংকর খানিক আগেই শয্যা থেকে উঠে মাইনের দিকে চলে গেছে; কেননা আজ থেকে আবার মাইনের কাজ শুরু হবার কথা।

ঝুমন চায়ের জল চাপিয়ে দু' দু'বার সুব্রতর ঘরের কাছে এসে ফিরে গেছে, সুব্রত নিদ্রিত দেখে।

শয়ন ঘর থেকে বের হয়ে সুব্রত ডাকল, ঝুমন।

সাব্, ঝুমন সামনে এসে দাঁড়াল।

কী রে, তোর চা ready তো?

ঝুমন হাসতে হাসতে জবাব দিল, জি সাব্?

ম্যানেজারবাবু কোথায়?

খাদে গেছেন হুজুর।

চা খেয়ে গেছে?

আজ্ঞে না। বলেঁ গেছেন আপনি ঘুমিয়ে উঠলে তিনি এর মধ্যে ফিরে আসবেন, তারপর এক সঙ্গে দু'জনে চা খাবেন।

বেশ। তবে তুই চায়ের সব জোগাড় কর। আমি ততক্ষণ চট্‌পট্ হাত পা ধুয়ে নিই, কি বলিস?

জি সাব্—

ঝুমন নিজের কাজে রান্না ঘরের দিকে চলে গেল।

সুব্রত বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে গরম ওভার কোটটা গায়ে চাপিয়ে চায়ের টেবিলের কাছে এসে দেখে শংকর এর মধ্যে কখন মাইন থেকে ফিরে চায়ের টেবিলের সামনে এসে বসে আছে।

তাহলে শংকরবাবু? মাইনের কাজ শুরু করে দিয়ে এলেন?

অ্যাঁ। কে? ও সুব্রতবাবু? কী বলছিলেন?

মাইনের কাজ শুরু হবার আজ সকাল থেকে Order ছিল না? কাজ শুরু হলো?

হ্যাঁ হয়েছে। কিন্তু একটা বিচিত্র আশ্চর্যের ব্যাপার ঘটেছে। মনে হচ্ছে এটা কী যেন ভেল্কী বাজীর খনি।

ব্যাপার কী? সুব্রতর দৃষ্টিটা প্রখর হয়ে উঠলো।

ঝুমন গরম চা, রুটি, মাখন, ডিমসিদ্ধ ও কেক সাজিয়ে দিয়ে গেল সামনের টেবিলের ওপরে।

একটা সিদ্ধ ডিমের অর্ধেকটা কাঁটা দিয়ে ভেঙে নিয়ে সেটা গালে পুরে চিবোতে চিবোতে শংকর বলল, তা ছাড়া কি বলব বলুন? ১৩নং কাঁথিতে মরলো দশজন। কয়লার চাংড়া সরিয়ে মৃতদেহ পাওয়া গেল মোটে একটা।

তার মানে? সুব্রত বিস্মিত দৃষ্টিতে শংকরের মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ মশাই, এত বিস্মিত হচ্ছেন কেন? ১৩ নং কাঁথিতে মৃতদেহ মাত্র একটিই পাওয়া গেছে।

তবে যে শুনছিলাম দশজন মারা গেছে? সুব্রত রুদ্ধনিশ্বাসে বললে।

তাই তো শোনা গিয়েছিল এবং লিস্টমত দশ জনকে পাওয়াও যায়নি—কিন্তু কয়লা সরিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করার পর দেখা যাচ্ছে মাত্র একটিই।

বলেন কি! —ভাল করে খুঁজে দেখা হয়েছিল তো? সুব্রত প্রশ্ন করলে।

আমি নিজে পর্যন্ত দেখে এসেছি। মানুষ তো দূরের কথা একগাছি চুলও দেখতে পেলাম না।

আশ্চর্য। ...

তারপর, আবার সুব্রত জিজ্ঞাসা করল ঃ ১৩নং কাঁথিতে কাজ চলছে নাকি?

না। ১৩নং কাঁথিতে কাজ একদম বন্ধ করে রেখে এসেছি।

বেশ করেছেন। চলুন, চা খেয়ে আমি একবার সেই ১৩নং কাঁথিটা ঘুরে দেখে আসব।

বেশ তো চলুন। উদাসভাবে শঙ্কর জবাব দিল।

চা পান শেষ করে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দু'জনে বাইরের রাস্তায় এসে দাঁড়াল। ... এমন সময় দেখা গেল বিমলবাবুর সঙ্গে অদূরে দারোগা-বাবু আসছেন।

দারোগাবাবুই আগে হাত তুলে নমস্কার জানালেন, নমস্কার সুব্রত-বাবু। নমস্কার মিঃ সেন।

ওরা দু'জনেই প্রতি-নমস্কার জানাল।

দারোগাবাবুই প্রশ্ন করলেন, কোথায় মশাই আপনাদের শালবনে খুন হয়েছে?...

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি খবরটা পেলেন কি করে? সুব্রত শুধায়।

এ দিকে আসছিলাম—পথেই চিঠিটা পেলাম। কিন্তু—

কি?

এতক্ষণ প্রায় আধঘণ্টা ধরে আমি বিমলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে তন্ন তন্ন করে

শালবন নদীর ধার পর্যন্ত খুঁজে এলাম কিন্তু কোথাও তো মশাই লাসের টিকিটিরও দর্শন পেলাম না...অন্ধকারে ভুল দেখেননি তো?

সুব্রত চম্‌কে উঠ্‌ল, আপনি বলছেন কী স্যার? —আমার চোখের সামনে ব্যাটা ছটফট করে মরল, আর আমি ভুল দেখলাম।

তবে বোধ হয় ব্যাটা মরে ভূত হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সুব্রতবাবু। হাসতে হাসতে দারোগাবাবু বললেন।

দেখুন দারোগাবাবু। নেশা ভাঙের অভ্যাস আমার জীবনে নেই তাছাড়া চোখের দৃষ্টি এখনও আমার খুবই প্রখর ও সজাগ।

কিন্তু লাসটা তাহলে কোথায়ই বা যাবে বলুন? কথাটা বললেন বিমলবাবু।

কোথায় যাবে তা কী করে বলব? পাওয়া যখন যাচ্ছে না তখন নিশ্চয়ই কেউ রাতারাতি লাস সরিয়ে নিয়ে গেছে।

কিন্তু ওই শালবনে অত রাত্রে যে একটা লোক খুন হয়েছে সে-কথা লোকে জানলই বা কেমন করে যে সরিয়ে নেবে রাতারাতি? দারোগাবাবু বললেন।

এবার সুব্রত আর না হেসে থাকতে পারলে না। হাসতে হাসতে বললে, তা যা বলেছেন, তবে, যে খুনী সে তো জানতই লোকটা মারা গেছে, বিশেষ করে বন্দুকের গুলি খেয়ে যে বাঁচা চলে না, এবং সে গুলি যখন পাঁজরা ভেদ করে গেছে।—

তবে কি আপনি বলতে চান সুব্রতবাবু, খুনীই লাস সরিয়েছে?—

বলতে আমি কিছুই চাই না। —লাস কেউ সরিয়েছে বা সরায় নি এ সম্পর্কে কোন তর্ক বিতর্ক করাই আমার ইচ্ছা নেই। আপনারা যে সিদ্ধান্তে ইচ্ছা উপস্থিত হতে পারেন এবং যেমন খুশী further proceed করতে পারেন। তবে এটা ঠিকই জানবেন কাল একজন কুলী শালবনে বন্দুকের গুলিতে খুন হয়েছিল।

আপনার কথাই যদি ধরে নেওয়া যায়, অর্থাৎ খুনীই লাস সরিয়ে থাকে, তবে কোথায় সরালে? দারোগাবাবু সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন।

কেমন করে বলব বলুন? আমার সঙ্গে পরামর্শ করে তো আর লাস সরায় নি।—

তাও তো ঠিক। তাও তো ঠিক। দারোগাবাবু মাথা দোলাতে লাগলেন পরম বিজ্ঞের মত।

তের

মৃতদেহ

দারোগাবাবু ও যেন অতঃপর কেমন সব গোলমাল হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে তিনি বললেন, চলুন না সুব্রতবাবু।

—আমার সঙ্গে একটিবার সেই শালবনে; কোথায় আপনি মৃতদেহ দেখে এসেছিলেন, exact locationটা দেখাবেন।

নিশ্চয়ই, চলুন।—

সকলে নদী পার হয়ে শালবনের দিকে এগিয়ে চলল।

প্রভাতের সোনালী রোদ শালবনের গাছের পাতার ফাঁকে ইতস্ততঃ উঁকি দিচ্ছে।

শীতের প্রভাতের ঝিরঝিরে হাওয়া শালবনের গাছে সবুজ কচিপাতা-গুলিকে মৃদু মৃদু শিহরণ দিয়ে বহে যায়।

সকলে এসে শালবনের মধ্যে প্রবেশ করল।

কোথায় দেখেছিলেন কাল রাত্রে সেই মৃতদেহ সুব্রতবাবু? দারোগাবাবু প্রশ্ন করলেন।

ওই শালবনের দক্ষিণ দিকে।

গতরাত্রের সেই জায়গায় সকলে সুব্রতর নির্দেশ মত এসে দাঁড়াল।

আশেপাশে কয়েকটা বড় বড় শালগাছ ছোট একটা জায়গাকে যেন আরো ছায়াচ্ছন্ন ও নির্জনতর করে ঘিরে রেখেছে।

এই সেই জায়গা দারোগাবাবু, সুব্রত বললে।

সেই জায়গার মাটিতে তখনও রক্তের দাগ জমাট বেঁধে শুকিয়ে আছে দেখা গেল।

সুব্রত সেই জমাটবাঁধা রক্তের দাগগুলোর দিকে অঙ্গুলি তুলে বলল, এই দেখুন দারোগাসাহেব, আমি যে গত রাত্রে স্বপ্ন দেখিনি বা আমার চোখের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেনি তার প্রমাণ। এই মাটির বুকে এখনও রক্তের দাগ রয়েছে।

সকলে তখন এক এক করে রক্তের দাগগুলো পরীক্ষা করে দেখল এবং সুব্রতর কথা যে মিথ্যা নয় এরপর সেটাই সকলে মেনে নিতে বাধ্য হলো।

তাই তো স্যার, এ যে তাজ্জব ব্যাপার। দারোগাবাবু, বলতে লাগলেন; কিন্তু মৃতদেহটা তবে কোথায় গেল?—

সুব্রত তখন চারিদিকে ইতস্তত অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চেয়ে কী যেন দেখছিল, দারোগাবাবুর কথার কোন জবাবই দিল না।

এদিক ওদিক চেয়ে দেখতে দেখতে সহসা একসময় সুব্রতর চোখের দৃষ্টিটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং সহসা সে চীৎকার করে বলে উঠল ঃ ইউরেকা! ইউরেকা! সম্ভবতঃ আপনাদের লাস পাওয়া গেছে দারোগা সাহেব। কিন্তু একটা শাবলের যে দরকার।

সুব্রতর উৎফুল্ল চীৎকারে সকলেই সুব্রতর দিকে ফিরে তাকাল।

ব্যাপার কী সুব্রতবাবু? শংকর বললে।

লাস পাওয়া গেছে শংকরবাবু? সুব্রত হাসতে হাসতে বললে।

লাস পাওয়া গেছে? আপনার মাথা খারাপ হলো নাকি সুব্রতবাবু? দারোগাবাবু বললেন।

দয়া করে একটা শাবল আনিয়ে দিন। আমি এখনই প্রমাণ করে দিচ্ছি।

তখনি বিমলবাবুকে খনিতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো একটা শাবল নিয়ে আসবার জন্য।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বিমলবাবু ছোট একটা মাটি খোঁড়া শাবল নিয়ে ফিরে এলেন। এই নিন স্যার শাবল।

সুব্রত বিমলবাবুর হাত থেকে শাবলটা নিয়ে একটা বড় শালগাছের গোড়া থেকে একটা ছোট শালগাছের চারা একটান দিয়ে অনায়াসেই শিকড় শুদ্ধ তুলে ফেলে দিয়ে ক্ষিপ্র হস্তে মাটি খুঁড়তে লাগল। বেশি মাটি খুঁড়তে হলো না, খানিকটা মাটি উঠে আসবার পরই একটা মানুষের হাত দেখা গেল।

এই দেখুন দারোগাসাহেব, আমার কথা ঠিক কিনা?

এই দেখুন লাস।... সুব্রতর সমগ্র শরীর ও কণ্ঠস্বর প্রবল একটা উত্তেজনায় যেন কাঁপছে।

তারপর অল্প অনায়াসেই মাটি থেকে মৃতদেহ খুঁড়ে বের করা হলো। মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখা গেল, সুব্রত যা বলেছিল, ঠিক তাই। মৃতদেহের পাঁজরায় গুলির ক্ষতও রয়েছে।

দারোগাবাবু এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নি, যেন বোকা বনে গেছেন। এমন ব্যাপার যে একটা ঘটতে পারে এ যেন ইতিপূর্বে তাঁর ধারণার অতীত ছিল। তিনি একজন দারোগা। এক আধ বছর নয়, প্রায় দীর্ঘ এগার বছর এই লাইনে চুল পাকাচ্ছেন অথচ এই সামান্য সম্ভাবনাটা তাঁর মাথায় খেলে নি। খেলল কিনা সামান্য একজন সখের গোয়েন্দার সহচরের মাথায়।

দারোগাবাবু একটু গম্ভীরই হয়ে গেলেন।

এবার বিশ্বাস হয়েছে তো স্যার আমার কথার পুরোপুরি? সুব্রত দারোগাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হাসতে হাসতে প্রশ্ন করল।

এখনও আর না বিশ্বাস করে কেউ পারে নাকি সুব্রতবাবু? বললে শংকর। কিন্তু আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা না করে আমি পারছি না সুব্রতবাবু।

বুদ্ধির কিছু নয়—common sense শংকরবাবু; বুদ্ধি যদি বলেন সে আমার বন্ধু ও শিক্ষাগুরু কিরীটী রায়ের আছে, সুব্রত বললে। শেষের দিকে তার কণ্ঠস্বর শ্রদ্ধায় যেন রুদ্ধ হয়ে এল।

কিন্তু কেমন করে বুঝলেন বলুন তো সুব্রত বাবু, যে লাস এখানে লুকান আছে?

বললাম তো common sense । এই গাছটা লক্ষ্য করে দেখুন। গাছের পাতাগুলো যেন নেতিয়ে গেছে। এটাই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বাকীটা আমার অনুমান—চারিদিকে চেয়ে দেখুন, চারা গাছ আরো দেখতে পাবেন, কিন্তু কোন গাছেরই পাতা এমন নেতান নয়। প্রথমেই আমার মনে হলো, ঐ গাছের পাতাগুলো অমন নেতিয়ে গেছে। কেন? তখনি গাছটার পাশে ভাল করে চাইতেই মাটির দিকে নজর পড়ল। একটু ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেই বোঝা যায় পাশের মাটিগুলো যেন কেমন আলগা। মনে হয় কে যেন চারপাশের মাটি খুঁড়ে আবার ঠিক করে রেখেছে। যেই এ কাজ করে থাকুন না কেন, লোকটার যথেষ্ট প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আছে বলতেই হবে। মাটি খুঁড়ে মৃতদেহ পুঁতে এই গাছটি অন্য জায়গা থেকে উপড়ে এনে এখানে পুঁতে দিয়ে গেছে যাতে করে কারও নজরে না পড়ে এবং স্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু গাছটি অন্য জায়গা থেকে উপড়ে আনার ফলে এক রাত্রেই নেতিয়ে উঠেছে আরো ভেবে দেখুন এক রাত্রের মধ্যে যেখানে গাড়ি, মোটর বা ট্রেনের তেমন কোনো ভাল বন্দোবস্ত নেই সেখানে একটা লাসকে সরিয়ে ফেলা কত কষ্টসাধ্য। তাছাড়া একটা মৃতদেহ অন্য জায়গায় সরানও বিপদসংকুল ব্যাপার! একে তো সকলের নজর এড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে, তার উপর ধরা পড়বার খুবই সম্ভাবনা। অথচ মৃতদেহটা এভাবে ফেলে রাখাও চলে না—তাই সরানই এক মাত্র বুদ্ধিমানের কাজ এবং আসে পাশে কোথাও পুঁতে ফেলতে পারলে সব দিকই রক্ষা হয় এবং ব্যাপারটাও সহজ সাধ্যকর হয়ে যায়।

যা হোক সকলে তখন লাসের একটা বন্দোবস্ত করে বাংলোর দিকে ফিরল। কারও মুখেই কোন কথা নাই। সকলে নির্বাকভাবে পথ অতিক্রম করছে।

সকলে এসে বাংলোয় প্রবেশ করল।

বিমলবাবু বাংলো পর্যন্ত আসেন নি, খনির দিকে চলে গেছেন মাঝপথ থেকে বিদায় নিয়ে।

বারান্দায় কয়েকটা বেতের চেয়ার পাতা ছিল। তিনজনে তিনটে চেয়ার টেনে বসল। দারোগাবাবুই প্রথম কথা বললেন, সুব্রতবাবু। ময়না তদন্তের রিপোর্টগুলো পড়েছেন নাকি?

হ্যাঁ, কাল রাত্রেই পড়ে ফেলেছি।

কি বুঝলেন?

সামান্যই। তার থেকে কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া চলে না। আচ্ছা দারোগাসাহেব, এই Case গুলোর Chemical examination এর reportগুলো আপনার কাছে আছে কি?

না। তবে যদি বলেন তো চেষ্টা করে আনিয়ে দিতে পারি হেড্ কোয়ার্টার থেকে; দরকার আছে নাকি?

হ্যাঁ, পেলে ভাল হতো। একটা কাজ করতে পারবেন দারোগাসাহেব?

বলুন।

একটু অপেক্ষা করুন। সুব্রত ঘরের মধ্যে চলে গেল এবং পরক্ষণেই কাগজে মোড়ান গত রাত্রের সেই তীরটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এল।

ব্যাপার কী? ওটা কী আপনার হাতে? দারোগাবাবু সুব্রতর হাতের কাগজে মোড়া তীরটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন।

কাগজের মোড়কটা খুলতে খুলতে সুব্রত বললে, এটা একটা তীর। এর ফলায় আমার মনে হয় কোন মারাত্মক রকমের বিষ মাখান আছে; দয়া করে এটা ধানবাদের কোন কেমিষ্টের কাছ থেকে একটু একজামিন করে কি বিষ আছে জেনে আমায় জানাতে পারেন?

চেষ্টা করতে পারি, তবে কতদূর সফল হবো বলতে পারি না। তার চেয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দিই না কেন? এক হপ্তার মধ্যেই Chemical Examination এর report পেয়ে যাবেন।

দেখুন যদি ধানবাদে্ সুবিধা না হয়, তবে কলকাতায়ই পাঠাবেন।

তখনকার মত চা ও জলখাবার খেয়ে দারোগাবাবু বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

শংকর খাদের দিকে রওনা হল। সুব্রত চেয়ারটার ওপরে গা এলিয়ে দিয়ে সমস্ত ঘটনাটা চিন্তা করতে লাগল।

চোদ্দ

রাত্রি যখন গভীর হয়

প্রতি রাতের মত আজও রাত্রির অন্ধকার ধূসর কুয়াশার ঘোমটা টেনে পায়ে পায়ে শ্রান্ত ক্লান্ত ধরণীর বুকে নেমে এল। পাখীর দল কুলায় গেল ফিরে। সারাদিন খনিতে খেটে ক্লান্ত সাঁওতাল কুলী কামিনরা যে যার ধাওড়ায় ফিরে এসেছে। সুব্রত চুপটি করে বারান্দায় একটা বেতের ডেক চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে দূরের দিকে তাকিয়ে ছিল।

কাল হয়ত কিরীটীর চিঠি পাওয়া যাবে। কিন্তু আজকের রাতটা?

একি নির্বিঘ্নে কাটবে?...

রাতের অন্ধকারে কী আজ তার বিভীষিকাময় মৃত্যুর কঠিন হিম পরশ কোন হতভাগ্যের ওপরে নেমে আসবে না?

দূর থেকে সাঁওতালী বাঁশী ও মাদলের সুর ভেসে আসে।

জীবনের কোন মূল্যই ওদের কাছে নেই। প্রকৃতির স্নেহের দুলাল ওরা মাটির ঘরে অযত্নে বর্ধিত, মাটি-মাখা সহজ ও সরল শিশুর দল। প্রাণ প্রাচুর্যে জীবনের পাত্র ওদের কানায় কানায় পূর্ণ।

শংকর এখনও খাদ থেকে ফেরে নি।

ঝুমন গরম চা, কেক ও ফল প্লেটে সাজিয়ে দিয়ে গেল।

সুব্রত একটুকরো কেক মুখে পুরে চায়ের কাপটা তুলে নিল। বাইরে আজ ঠাণ্ডাটা যেন একটু চেপেই এসেছে!

মাঝে মাঝে খোলা প্রান্তর থেকে আসন্ন রাতের স্তব্ধতা যেন বহন করে আনে হিমেল হাওয়ার ঝাপ্‌টা।

এক সময় চায়ের পাত্র নিঃশেষ করে সুব্রত পাশের টি'পয়ে সেটা নামিয়ে রেখে দিল।

কত রকম চিন্তাই একটার পর একটা মাথার মধ্যে এল মাকড়সার জালের মত।

এবং সেই জালের সূক্ষ্ম তন্তুগুলি বেয়ে বেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিটি দাগের মত কী যেন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

কী ওগুলো?

ভূতের মত একাকী চুপ করে এই বারান্দায় ঠাণ্ডায় বসে বসে কী ভাবছেন?

চোখ তুলে তাকায় সুব্রত।

কে? শংকরবাবু? সুব্রত ধীরকণ্ঠে বলে।

কী এত ভাবছিলেন বলুন তো? এখানে এসে আপনার এত কাছে দাঁড়িয়ে আছি, তবুও টের পাননি?

হাসতে হাসতে শংকর জিজ্ঞাসা করে।

এ বেলা কাজের অবস্থা কেমন? Peacefully work চলছে তো?

কতকটা, যদি কিছু দুর্ঘটনা আচম্‌কা না এসে পড়ে।

হঠাৎ এ কথা কেন শংকরবাবু?

বলা তো যায় না। শংকর মৃদুকণ্ঠে বলে, বিমলবাবুর ভাষায় বলতে গেলে এই ভৌতিক ফিল্ড-এ' যখন তখনই যে কোন ভয়ঙ্কর ব্যাপারই তো ঘটা সম্ভব সুব্রতবাবু। তা ছাড়া নূতন ম্যানেজারবাবু এখনও ভূতের হাতে আক্রান্ত হন নি যখন।

সুব্রত কোন কথা বলে না।

তারপর আপনার কাজ কতদূর এগুলো সুব্রতবাবু?

How far you have proceeded?

অনেকটা।

বলেন কী? শংকরের কণ্ঠস্বর উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ। —কিন্তু এখনও আমাদের দারোগাবাবু এসে পৌঁছালেন না।

দারোগাবাবুর এখন আসবার কথা আছে নাকি?

শংকর উৎকণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করে।

তাঁকে সন্ধ্যার পরই যে বাসটা থামে, তাতে দু'জন কনেস্টবল নিয়ে আসতে বলে দিয়েছিলাম।

কনেস্টবল নিয়ে আসতে বলেছিলেন? কেন? হঠাৎ কনেস্টবল নিয়ে আসবেন কেন? কাউকে গ্রেপ্তার করবেন নাকি?

শংকর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুব্রতর মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু চারিদিককার অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না। আবার শংকর প্রশ্ন করে। আমি যে অন্ধকারেই থাকছি সুব্রতবাবু। Please খুলে বলুন। কাকে গ্রেপ্তার করবেন?—

খুনীকে। —রহস্যের হোতাকে।

পেরেছেন বুঝতে তাহলে সত্যিই? পেরেছেন জানতে হত্যাকারী কে?

একরাশ উৎকণ্ঠা শংকরের গলার স্বরে ফুটে বেরুল।

হ্যাঁ—সুব্রত জবাব দেয়।

আপনিই বলুন কে? সুব্রত স্মিতভাবে শংকরের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

আগে বলুন, এই খনির Areaর মধ্যে সেই লোকটি আছে কিনা? তারপর বলছি।

শংকর সুব্রতর মুখের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করে।

যদি বলি আছে? সুব্রত মৃদুস্বরে জবাব দেয়।

তা হ'লে বলব আমি একজনকে সন্দেহ করেছি, সুব্রতবাবু।

কে? বিমলবাবু—এই খনির সরকার?

হ্যাঁ। কিন্তু আশ্চর্য, how could you guess! আপনারা দেখছি সর্বজ্ঞ। —am I right সুব্রতবাবু?

অধীরভাবে শংকর সুব্রতকে প্রশ্ন করে।

you are right শংকরবাবু। ধীরভাবে সুব্রত জবাব দেয়।

আজ তাহলে বিমলবাবুকেই গ্রেপ্তার করছেন বলুন। শংকরবাবু আবার জিজ্ঞাসা করেন।

এমন সময় দারোগাবাবু দুইজন কনেস্টবল সমভিব্যাহারে এসে হাজির হলেন। বাংলোর বারান্দায় উঠতে উঠতে দারোগাবাবু বললেন, আমরা এসে গেছি সুব্রতবাবু।

Many thanks. আসুন আসুন! everything O. K.? একটু চাপা গলায় বলে ওঠে।

Yes! everything O. K. —দারোগাবাবু জবাব দিলেন।

আপনারা তা হলে একটু অপেক্ষা করুন। আমরা চট্ করে খাওয়া দাওয়া সেরে ready হয়ে নিচ্ছি। উঠুন শংকরবাবু, রাত হয়ে গেছে, চলুন খেতে যাওয়া যাক্। চলুন।

সুব্রত ও শংকর দু'জনে উঠে পড়ল।

রাত্রি গভীর হয়েছে।

সুব্রত, শংকর, দারোগাবাবু তিনজনে নিঃশব্দে কালো কয়লার গুঁড়ো ও কাঁকর ঢালা অপ্রশস্ত রাস্তাটা, যেটা বরাবর অফিসারদের কোয়ার্টারের দিকে চলে গেছে সেই রাস্তা ধরে প্রেতের মত এগিয়ে চলে। সকলেরই পায়ে রবার সু। কাঁকর কয়লা বিছান রাস্তা দিয়ে চললেও কোন শব্দ পাওয়া যায় না।

সকলে এসে বিমলবাবুর কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়াল।

এর মধ্যেই চারিদিকে কুয়াশা জমেছে।

আশেপাশের সব কিছু আবছা অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিমলবাবুর কোয়ার্টারটা কুয়াশার ওড়না জড়িয়ে যেন আবছা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আগে সুব্রত ও তার পিছনে দারোগাবাবু ও শংকর পা টিপে টিপে বিড়ালের মত সন্তর্পণে বারান্দা অতিক্রম করে ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।—

ওকি! সুব্রত সবিস্ময়ে দেখল, দরজার দু'পাশের দুটো ভেজান কবাটের ফাঁক দিয়ে ইষৎ ম্রিয়মান একটা আলোকরশ্মি যেন অতি সন্তর্পণে বাইরে উঁকি দিচ্ছে ভয়ে ভয়ে।

সুব্রত একবার চেষ্টা করলে দরজার ফাঁক দিয়ে কিছু দেখা যায় কিনা। —কিন্তু কিছুই দেখা যায় না।

আঙ্গুলের চাপ দিতেই ভেজান দরজা আরো ফাঁক হয়ে গেল।

ঘরের এক কোণে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে—

প্রচুর ধূম উদ্গিরণ করে হ্যারিকেনের চিমনিটা কালো হয়ে ওঠায় আলো অত্যন্ত মলিন বলে মনে হয়।

প্রথমটায় সেই মলিন আলোয় সুব্রত কিছুই দেখতে পেল না; কিন্তু পরক্ষণেই ভাল করে দৃষ্টিপাত করতেই সুব্রত ভয়ংকর রকম চম্‌কে উঠ্‌লো।

ওকি! সেই শালবনে দেখা পাগলটা না?

কে একজন উপুড় হয়ে ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। পাগলাটা সেই ভূপতিত দেহের ওপরে ঝুঁকে অত্যন্ত নীচু হয়ে কী যেন করছে।

ডান হাতে পিস্তলটা বাগিয়ে, বাঁ হাতে টর্চটা ধরে...বোতাম টিপ্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই সুব্রত আচম্‌কা দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

টর্চের তীব্র আলোর ঝাপ্‌টা মুখের ওপরে পড়তেই পাগলটা চমকে লাফিয়ে উঠলো।

কিন্তু একি। পাগলটার হাতে একটা উদ্যত পিস্তল।

সুব্রত থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

কে তুই? বল শীগগির কে তুই?

সহসা একটা উচ্চ রোলের হাসির প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে সমগ্র ঘরখানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

পাগলাটা হাসছে।

সকলেই স্তম্ভিত, বাক্‌হারা।

হঠাৎ পাগলটা হাসি থামিয়ে স্বাভাবিক গলায় ডাকল, সুব্রত।

সুব্রত চম্‌কে উঠল।

কে?—

ভয় নেই আমি কিরীটী।

অ্যাঁ। কিরীটী তুই। একি বিস্ময়।

সঙ্গে সঙ্গে শংকরও বলে উঠল, কিরীটী তুই।

হ্যাঁ। কেন, এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে, আমি শ্রীহীন কিরীটী রায়।

কিন্তু ব্যাপার কী? মাটিতে পড়ে লোকটা কে?

সুব্রত কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।

বিমলবাবুর মৃতদেহ।

কার? কার মৃতদেহ? অস্ফুটকণ্ঠে সুব্রত চীৎকার করে উঠল।

কোলিয়ারীর সরকার বিমলবাবু। যাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য তোমাদের আজকের রাত্রের এই দুঃসাহসিক অভিযান বন্ধু। চল বন্ধু। এবার বাসায় চল। ... দারোগাবাবু আপনার সঙ্গে যে কনেস্টবল দু'টি এনেছেন, এই মৃতদেহ তাদের জিম্মায় আজকের রাতের মত রেখে চলুন শংকরের বাংলোয় ফেরা যাক। চল। চল সুব্রত। ... হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? ... গাম ইলাস্টিক দিয়ে এক মুখ দাড়ি করে চুল্‌কে চুল্‌কে প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হবার জোগাড় হলো।

কিন্তু ... সুব্রত আম্‌তা আম্‌তা করে বললে।

এর মধ্যে আবার কিন্তু কী হে ছোকরা। ... চল । চল। রাত কত হলো তার খবর রেখেছিস? বাড়ীতে চল, ধীরে সুস্থে বলব।

তা হলে বিমলবাবু....

সুব্রতর কথা শেষ হলো না। কিরীটী বলে উঠ্‌ল, আজ্ঞে না You are mistaken, বিমলবাবু খুনী নন।

তবে?

তবে আবার কি? অন্য লোক খুনী।

কে খুনী?

কাল সকালে বলব। এখন চল বাংলোয় ফেরা যাক।

কিন্তু আমার যে কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে কিরীটী? সুব্রত বললে।

অর্থাৎ তুমি একটি হস্তীমুর্খ। শোন, কানে কানে একটা কথা বলি।

সুব্রতর কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা স্বরে কিরীটী কি যেন ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলতেই সুব্রত লাফিয়ে উঠলো, অ্যাঁ বলিস কি—আশ্চর্য! আশ্চর্য!!...

কিন্তু তার একটি ডান ও একটি বাঁ হাত ছিল যন্ত্র স্বরূপ। কিরীটী বললে, এই হতভাগ্য বিমলবাবু হচ্ছে বাঁ-হাত।

সে রাত্রে বাংলোয় ফিরে গরম জল করিয়ে কিরীটী ছদ্মবেশ ছেড়ে স্থির হতে হতে প্রায় আড়াইটা বেজে গেল।

পনের

রহস্যের মীমাংসা

ঝুমনকে ডেকে শংকর কিছু লুচি ও তরকারী করবার জন্য আদেশ দিতেই, কিরীটী বাধা দিলে, আরে ক্ষেপেছিস শংকর, এই রাত্রে মিথ্যে কেন ও বেচারীকে কষ্ট দিবি? তার চাইতে বল এক কাপ গরম গরম চা বানিয়ে দিক। আর তার সঙ্গে ঘরে যদি 'কেক' 'বিসকিট্' কিছু থাকে তবে তাই দু'চারটে দে, তাতেই হয়ে যাবে।

ঘরে কেক ছিল। ঝুমন একটা প্লেটে করে কয়েকটা plum cake ও এক কাপ চা এনে কিরীটীর সামনে টি'পয়ে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললে, দিই না সাহেব কয়েকটা লুচি ভেজে, কতক্ষণ লাগবে?

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, ওরে না না। তুই শুতে যা। এতেই আমার হবে, কাল যদি এখানে থাকি তো বেশ করে পেট ভরে খাওয়াস।

ঝুমন চলে গেল।

কিরীটী জামার পকেট থেকে চুরোট বের করে তাতে অগ্নি সংযোগ করে মৃদু টান দিতে লাগল।...

কিছুক্ষণ ধূমপান করবার পর প্রায়-ঠাণ্ডা চায়ের কাপটা তুলে নিতে নিতে বললে। Cold tea with a Burma Cigar ;

Is a joy for ever।

সকলে এক সঙ্গে হেসে উঠল, কিরীটীর নিজস্ব কবিতা শুনে।

কিন্তু আমার শরীর যে ঘুমে ভেঙে আসছে শংকর, শীঘ্র কোথায় শুতে দিবি বল। কিরীটী শংকরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল।

শংকর নিজের ঘরেই এক পাশে একটা ক্যাম্প খাটে কিরীটীর শোয়ার বন্দোবস্ত করে দিল।

কিরীটী শয্যার ওপরে গা এলিয়ে দিয়ে লেপটা টেনে নিল।

পরের দিন সকালে শংকর ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে।

এমন সময় একজন সাঁওতাল কুলী ছুটতে ছুটতে এসে হাজির

বাবু হুজুর মালিক এসেছেন গো।—

মালিক, কখন এলেন তিনি?

কাল রাতে বাবু।

কে কাল রাতে এসেছেন শংকর?

চম্‌কে ফিরে তাকিয়ে দেখি খোলা দরজার ওপরে দাঁড়িয়ে কিরীটী?

খনির মালিক সুধাময়বাবু কাল রাত্রে এসেছেন।

যা তাড়াতাড়ি মনিবের সঙ্গে একবার মোলাকাত করে আয়।—

হ্যাঁ যাই।—

হাত মুখ ধুয়ে শংকর তখুনি মনিবের সঙ্গে দেখা করতে ছুটল।

খনির অল্প দূরে মাঠের মধ্যে একটা বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ি।

খনির দু'জন অংশীদার হনুমানপ্রসাদ ঝুন-ঝুন-ওয়ালা আর সুধাময় চৌধুরী? অংশীদারের মধ্যে কেউ কখন এলে ঐ বাংলো বাড়িতেই ওঠেন। অন্য সময় বাংলো তালা চাবি দেওয়াই থাকে।

শংকর যখন এসে বাংলো বাড়িতে প্রবেশ করল, সুধাময় বাবু তখন ঘুম ভেঙে উঠে বসে ধূমায়িত চায়ের সঙ্গে গরম গরম লুচির সদ্ব্যবহার করছেন।

ভৃত্যকে গিয়ে সংবাদ পাঠাতেই শংকরের ভিতরে ডাক এল। বহুমূল্য আসবাব পত্রে সাজান কক্ষখানি ; গৃহস্বামীর রুচির পরিচয় দেয়।

একটা বেতের চেয়ারে বসে সুধাময়বাবু প্রাতরাশ খাচ্ছিলেন।

শংকর ঘরে ঢুকে হাতে তুলে নমস্কার জানাল, নমস্কার ... স্যার।

নমস্কার। বসুন। আপনিই এখানকার নতুন ম্যানেজার শংকর সেন?

আজ্ঞে।

বেশ। বেশ।

শংকর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

ওরে কে আছিস, ম্যানেজারবাবুকে চা দিয়ে যা।

সুধাময়বাবু হাঁক দিলেন।

না না। ব্যস্ত হবেন না। এইমাত্র বাড়ি থেকে চা খেয়ে বেরিয়েছি।

তাতে আর কী? add a cup more, কোন harm নেই।

শংকর সুধাময়বাবুর দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

উঁচু, লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা। মাথার মাঝখানে সিঁথি। চোখা নাক। চোখ দুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিন্তু বেশ লাল্‌চে। শিকারী বিড়ালের মত সদা চঞ্চল, অস্থির ও সজাগ। গায়ের রং আব্‌লুশ কাঠের মত কালো। ভদ্র বেশ না হলে সাঁওতালদেরই একজন ধরা যেতে পারে অনায়াসেই। গায়ে বাদামী রংয়ের দামী সার্জের গরম স্যুট।

ভৃত্য চা দিয়ে গেল। শংকর চায়ের কাপটা টেনে নিল।

তারপর মিঃ সেন, আপনাদের কাজকর্ম চলছে কেমন?

মন্দ না। তবে পরপর এমনভাবে খুন হওয়ায় এখানকার কুলী কামিনদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া কাল রাত্রে আমাদের সরকারমশাই বিমলবাবু অদৃশ্য আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন।

কে নিহত হয়েছে?

বিমলবাবু?

The villain. Rightly served. I hated him most amongst my employees ; but I am also determined to give up my shares. I am really fed-up with all this. ঝুন-ঝুনওয়ালাও আজই বিকালের দিকে এসে পৌঁছাচ্ছেন। শুনলাম তিনিও বেচে দেবেন তাঁর share.

মনিবকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে কাজকর্ম দেখে, শংকরের বাংলোয় ফিরতে ফিরতে বেলা দুটো বেজে গেল।

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ধরিত্রীর বুকে যেন রহস্যের যবনিকার মত নেমে এসেছে।

শংকরের ডাক-বাংলোয়, সকলে একত্রিত হয়েছে। খনির দুই অংশীদার, সুধাময় চৌধুরী ও হনুমান প্রসাদ ঝুন-ঝুন-ওয়ালা, সুব্রত, কিরীটী, দারোগাবাবু ছদ্মবেশে ও শংকর নিজে। কিরীটী বলছে আজ অপরাধী কে সকলের সামনে প্রকাশ করে বলবে এবং হাতে হাতে দারোগাবাবুর জিম্মায় দিয়ে দেবে। সুধাময়বাবু ও ঝুন-ঝুন-ওয়ালা দু'জনেই বলেছেন অপরাধীকে ধরিয়ে দিতে পারলে দু'জনেই পাঁচ-হাজার করে দশ হাজার টাকা কিরীটীকে পুরস্কার দেবেন।

কিরীটী বলতে লাগল ঃ Before I mention the name let me have my reward first of all with the promise that if I fail I will return the same।

সুধাময়বাবু ও ঝুন-ঝুন-ওয়ালা দু'জনেই হাসতে হাসতে পাঁচ হাজার করে দশ হাজার টাকার দু'খানা চেক লিখে দিলেন, এই নিন্।

তা হলে আপনারা সকলে শুনুন।

এই খনি অভিশপ্তও নয়, ভূতের আস্তানাও নয়; প্রচুর লাভের খনি। ...এবং আজ পর্যন্ত এই খনিতে যতগুলো খুন হয়েছে তার জন্য সর্বাংশে দায়ী খনির অন্যতম অংশীদার স্বয়ং সুধাময় চৌধুরী।...

ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলেও বোধ হয় এতটা কেউ চমকে উঠত না।

প্রবল ব্যঙ্গ মিশ্রিত স্বরে সুধাময়বাবু প্রচণ্ড হাসির তুফান তুলে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর এক হাত প্যাণ্টের পকেটে —সহসা পিস্তলের গর্জন শোনা গেল।

গুড়ুম।

উঃ। একটা বেদনার্ত চিৎকার করে সুধাময়বাবু একপাশে টলে পড়লেন, এক হাত দিয়ে ডানদিকে পাঁজরা চেপে ধরে অন্যহাত থেকে একটা রিভলভার ছিট্‌কে পড়ল।

শয়তান। কুকুর। তোকে কুকুরের মতই গুলী করতে বাধ্য হলাম, দারোগাসাহেব গর্জন করে উঠল—না হলে তুই-ই হয়ত এখনি আমায় গুলী করতিস। জীবনে আজ এই প্রথম সত্যিকারের গুলী করতে বাধ্য হলাম, কিন্তু তার জন্য আমার এতটুকুও অনুশোচনা হচ্ছে না। যে নৃশংস এতগুলো খুন পর পর করতে পারে—তার একমাত্র শাস্তিই পাগলা কুকুরের মত গুলী করে মারা।—

উঃ। কিরীটীবাবু। আপনার কথাই ঠিক। অতি লোভ সত্যিই শেষ পর্যন্ত আমার মৃত্যুর কারণ হলো।—হ্যাঁ স্বীকার করছি আমি—আমিই সব খুন করেছি। —উঃ।—

ধীরে ধীরে হতভাগ্য সুধাময় চৌধুরীর প্রাণবায়ু বাতাসে মিশে গেল।

সহসা যেন নাটকের যবনিকাপাত ঘটল।

ঘরের সব কয়টি প্রাণীই স্তব্ধ।

কারও মুখে কোন কথা নেই।

কিরীটী এতক্ষণে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল, এবারে আমি আমার বক্তব্য সব সংক্ষেপে শেষ করব। কেন না, আজকের রাত্রের bus-ই আমার ধরতে হবে। একটা কথা সর্বাগ্রে আপনাদের কাছে খুলে না বললে আমার এই ব্যাপারে explanationটা সহজবোধ্য হবে না। বর্তমানে এই যে এখানকার কোলিয়ারীটা দেখছেন, ৫০ বছর আগে এই কোলিয়ারীর পাশের ঐ একটা কোলিয়ারী হঠাৎ একদিন দ্বিপ্রহরে কোন অজ্ঞাত কারণবশতঃ ধ্বসে যায় এরূপ কিংবদন্তী আছে। তারপর থেকেই এখানকার আশেপাশের লোকেরা এ জায়গাটা সম্পর্কে নানা প্রকার মনগড়া বিভীষিকার কথা তুলে এটাকে অভিশপ্ত করে তোলে। এমনি করে দীর্ঘ চল্লিশটা বছর কেটে যায়।

কেউ এর পাশে ঘেঁষে না।

এমন সময় কোলিয়ারী শুরু করবার ইচ্ছায় মিঃ ঝুন-ঝুন-ওয়ালা ও সুধাময় চৌধুরী এদিকে ঘুরতে ঘুরতে এই অভিশপ্ত ফিল্ডটার সন্ধান

পান এবং অচিরে এটার লিজ্ নেন নব্বই বছরের জন্য খুব সামান্য টাকায়।

কিন্তু কাজ আরম্ভ করতে আরও বছর চারেক কেটে যায়।

তারপর কাজ শুরু হলো।

কাজ বেশ এগুচ্ছে এবং ফিল্ড থেকে প্রচুর কয়লা উঠছে।

এই সময় শয়তান সুধাময়ের মনে কু-মতলব জাগল। তিনি মনে মনে বদ্ধপরিকর হলেন ঝুন-ঝুন-ওয়ালাকে ফাঁকি দিতে। কিন্তু কেমন করে ঝুন-ঝুন-ওয়ালাকে সরান যায় সেই চিন্তা করতে লাগলেন।

একদিন খনির কাজ পরিদর্শন করতে এসে সামান্য অজুহাতে খনির সরকার বিকাশবাবু ও ম্যানেজারের এ্যাসিস্‌টেন্ট সত্যকিংকরবাবুকে বরখাস্ত করে নিজের লোক বিমলবাবু ও চন্দনসিংহকে নিযুক্ত করে গেলেন।

চন্দনসিং ও বিমলবাবু ছিল সুধাময়বাবুর ডান ও বাঁ হাতের অপকর্মের প্রধান সঙ্গী ও সহায়ক। বিমলবাবু ও চন্দনসিং সুধাময়বাবুকে সকল সংবাদ সরবরাহ করত ও খনিটা ভৌতিক এই কিংবদন্তীকে আরো সুদৃঢ় করবার জন্য প্রোপাগাণ্ডা চালাত দিবারাত্র নানাভাবে।

সুধাময়বাবুর রং ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। নিজে বহুকাল সাঁওতাল পরগণায় ঘুরে ঘুরে সাঁওতালদের সামাজিক রীতিনীতি আচারব্যবহার ও কথাবার্তাও পুরোপুরিভাবেই আয়ত্ত করেছিলেন, এবং যাতে করে তিনি অনায়াসেই, সাঁওতাল কুলীদের মধ্যে তাদেরই একজন সেজে দিব্যি খোশ মেজাজে একের পর এক খুন করে চলেছিলেন। অথচ কেউ কোনদিন সন্দেহ করবার অবকাশ পায় নি।

সুব্রতকে পাঠিয়ে দিয়েই আমি গোপনে পরের দিন সকালেই পাগলের ছদ্মবেশে এখানে চলে আসি এবং চারিদিকে নজর রেখে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করি।

আমার কেন যেন মনে হয়, যে খুন করেছে এইভাবে পরপর ম্যানেজারদের, সে এখানেই সর্বদা উপস্থিত থাকে। কিন্তু কীভাবে সে এখানে থাকতে পারে? কর্মচারীদের মধ্যে একজন হয়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয় ; কেন না তাতে চট্ করে ধরা পড়বার সম্ভাবনা খুব বেশি। তবে কেমন করে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে। অথচ এ কথা যখন অবধারিত এখানে সর্বদা উপস্থিত না থাকলে চারিদিকে দেখে শুনে তার পক্ষে খুন করা সম্ভব হয় না, তখন নিশ্চয়ই কুলীদের মধ্যেই তাদের একজন হয়ে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে।

সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান শুরু করে দিই।

এবং এখানে আসবার দিন রাত্রে যখন কুলীদের মধ্যে একজন খুন হলো, সে সময় আমি কুলীদের ধাওড়ার মধ্যেই কুলী সেজে উপস্থিত ছিলাম; কুলীটাকে খুন করে সুধাময় কুলীর ছদ্মবেশে যখন পালায় তখন আমি অন্ধকারে অনুসরণ করে তার ঘরটা দেখে আসি।

বিমলবাবু ও চন্দনসিং-এর সাহায্যে নয়জন কুলীকে রাতারাতি ধানবাদ কাজের অছিলায় হাঁটা পথে রেল লাইন ধরে প্রচুর টাকা ঘুস দিয়ে বিদায় করে। মাত্র একজন কুলি নিয়ে বিমলবাবুর সাহায্যে রামলোচনের জামার পকেট থেকে চাবি চুরি করে, খনির মধ্যে নেমে ডিনামাইট্ দিয়ে পিলার ধ্বসিয়ে ১৩নং কাঁথি ভাঙ্গা হয় তাও আমার নজর এড়ায় না। সুব্রত তুমি রুমালে বাঁধা পলতে ও ডিনামাইট্ পেয়েছ।

পরের দিন সকলে জানল ১০জন লোক মারা গেছে। যদিও মারা গেল একজন মাত্র। এটা শুধু কুলীদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার করবার জন্য সাজিয়ে করা হয়েছিল।

ম্যানেজারদের মারা হয় চারিদিকে সকলের মনে একটা ভয়াবহ আতঙ্ক জাগাবার জন্য যাতে করে খনির কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং খনির কাজ বন্ধ হয়ে গেলে নিজে শেয়ার ছেড়ে দেবার ভাণ দেখিয়ে ঝুন-ঝুন-ওয়ালাকে দিয়ে তার শেয়ারও বিক্রয় করিয়ে বেনামীতে সমগ্র খনিটা কিনে নিলেই কাজ হাসিল হয়ে যায়।

সব কিছু প্রায় হয়ে এল, সুধাময় ঝুন-ঝুন-ওয়ালার সঙ্গে চিঠিপত্র লিখে যখন সব ঠিক করে ফেললে তখন তার অপকর্মের সহায়ক বিমলবাবু ও চন্দনসিংহকে সরাবার মতলব করল।

গতকাল বিমলকে মারলেও চন্দন সিং নাগালের বাইরে পালিয়ে গেল। কেন না প্রভুর মনোগত ইচ্ছাটা সে আগেই টের পেয়েছিল। Metallic nails পরে তাতে বিষ মাখিয়ে হাতের আঙ্গুলে পরে, তার সাহায্যে গলা টিপে সুধাময় কাজ হাসিল করত। Strangle করবার সময় সেই Metallic nails গলার মাংসে বসে গিয়ে বিষের ক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটাত। এখন কথা হচ্ছে শার্দুলের ডাক যেটা শোনা যেত সেটা আর কিছুই নয়; সুধাময় নিজেই মুখ দিয়ে বাঘের হুবহু অনুকরণ করতে পারত। তোমরা হয়ত শুনে থাকবে এক একজন অবিকল পশু পক্ষীর ডাক মুখ দিয়ে অনুকরণ করতে পারে। এটা একটা মানুষকে ভয় দেখাবার ফন্দি। তা ছাড়া খুব উঁচু হিলওয়ালা এক প্রকার কাঠের জুতো পরে গায়ে একটা ধূসরবর্ণের ওড়না চাপিয়ে সুধাময় মাঠের মধ্যে দিয়ে দ্রুতবেগে চলত। একে সে একটু বেশী রকম লম্বা ছিল, তার উপরে ওই কাঠের জুতো পরাতে তাকে বেশ অস্বাভাবিক

রকম বলে মনে হতো। কাঠের জুতো ব্যবহার করবার মধ্যে আরো একটা মতলব তার ছিল; পায়ের ছাপ পড়ত না। সুব্রতকে মারবার জন্য একটা সাঁওতাল কুলীকে সুধাময়বাবুই, engage করেছিলেন; কুলীটা বিষাক্ত তীর ছুঁড়লো কিন্তু unsuccessful হলো; কিন্তু সুব্রতকে তীর ছোঁড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সুধাময়ও লোকটাকে গুলী করে মারে; আমিই সেই সময় ওদের পিছনে follow করতে করতে উপস্থিত ছিলাম বলে সব ব্যাপারই নিজের চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি। এই হল এখানকার খনির মৃত্যু রহস্য। কিরীটী চুপ করল।

আমাদের গল্পও এই খানেই শেষ হলো।

সমাপ্ত